প্রথম প্রকাশ : ১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৪

প্রকাশিকা
শুক্লা দে
শ্রী প্রকাশ ভবন
৬১ সূর্য সেন ষ্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী
চারু খান

মুদ্রাকর
চিত্তজিৎ দে
অরোরা প্রিণ্টার্স
৬১ সূর্য সেন ষ্ট্রীট
কলকাতা-৯

রহস্যময় রশ্মিলোক

এই পুস্তক ডি. পি. আই. (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক লাইব্রেরী ও প্রাইজের জন্য অনুমোদিত। Vide : Notification No. 160/TBC/2A-4T/74dt. 7. 4. 75.

সূচী

Rahasyamoy Rashmilok

—a Science fiction

Translated by :

Sailen Dutta

This is a co-production of Horst Erdmann Verlag & Co., Tübingen & Basle and Sree Prakash Bhaban, Calcutta.

রশ্মি—আমাদের চোখে যা ধরা পড়ে

জুলাই ২১, ১৮০১। গ্রীষ্মের এক মনোরম দিন। জার্মানির নির্বাচন—রাজ্য বাভেরিয়ার রাজধানীর মাথার ওপর ভাসমান ছেঁড়া ছেঁড়া কয়েক টুকরো মেঘের আড়াল থেকে সূর্যের উজ্জ্বল আলোকমালা এসে পড়ছে। মিউনিচের লোকেরা অনেকদিন পরে আজ যেন আবার সুখের মুখ দেখছে। দীর্ঘদিন ধরে নেপোলিয়নের সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামে ব্যর্থ হবার পর আজ আবার শান্তি ফিরে এসেছে, অন্তত মিউনিচের এই রাজ্যজুড়ে। মাত্র এক বছর আগেও মিউনিচ ছিল কর্সিকান বিজেতার অধিকৃত; আজ মিউনিচ আবার স্বাধীন, মুক্ত। হোহেনলিনডেনে পরাজিত হয়ে বাভেরিয়ার সেনাবাহিনী বহুদিন হলো ঘরে ফিরে গেছে। হিংসাশ্রয়ী যুদ্ধের ফলে যে ক্ষতের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল সারা দেশের বুকে, তাও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সেদিন, সারা য়ুরোপ যখন নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অত্যাচারে সদা সন্ত্রস্ত, তখন এতটুকু করুণার মূল্যও না জানি কতখানি ছিল। একজনের উচ্চাভিলাষের ফলে বিশ্ব যখন আতঙ্কগ্রস্ত, বাভেরিয়ার জনগণ তখন শান্তির দ্বীপে বাস করতে পেরে নিজেদের পরম সুখী মনে করেছিল।

কাউন্ট রামফোর্ডের তৈরি ইংলিশচর গার্টেনের নতুন পার্কে হাওয়া খেয়ে বেড়িয়ে মিউনিচের লোকেরা জীবনটাকে বেশ উপভোগ্য করে তুলেছিল। কিন্তু হঠাৎ, দূরবর্তী এক সুবিন্যস্ত পথের প্রান্তে একটা গোলযোগ সৃষ্টি হলো। বিপুল উত্তেজনায় ভর করে একটা মানুষ হাত দু'খানি আন্দোলিত করছে আর তাকে ঘিরে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে উঠেছে। নিশ্চয়ই আবার কিছু বেধেছে!

না, ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। সরু থিয়েরেক ষ্ট্রীটের দুটো পুরানো জরাজীর্ণ বাড়ি ধ্বসে পড়েছে আর তার ধ্বংসাবশেষের তলায় বারোটি লোক চাপা পড়েছে। বাঁচাতে হলে ওদেরকে এখনই মাটি খুঁড়ে বার করা দরকার।

থিয়েরেক স্ট্রীটের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী শাবল-কোদাল দিয়ে নিরলসভাবে ঐ ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে খুঁড়ে পথ করতে লাগল। বস্তুত প্রাণপণ প্রচেষ্টায় তারা এগিয়ে চলল, কারণ তাদের পশ্চাতে যে তাদের শাসক রাজকুমার চতুর্থ ম্যাক্সিমিলিয়ন জোসেফের তীক্ষ্ণ নজর। দুর্ঘটনার খবর কানে যাওয়া মাত্রই তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে এসেছেন। একজন নাগরিক পাশের ঘর থেকে তার জন্যে একটা চেয়ার এনে দিল, রাজকুমার রাস্তার ওপরই বসে পড়ে বিশেষ উদ্বেগের সঙ্গে পাইপ টানতে লাগলেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত মানুষদের ভাগ্যে কি আছে, না-জানা পর্যন্ত তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করবেন না— তাঁর চোখে-মুখে এমনই একটা সঙ্কল্প যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। দুটো বাড়ি ধ্বসে পড়েছিল। একটিতে থাকতো নিঃসন্তান তিনটি পরিবার। ওর ধ্বসে যাওয়া দেওয়ালের নিচে এগারোজন মানুষ চাপা পড়েছিল এবং ত্রাণকর্মীরা আরও ভয়ঙ্কর কিছুর আশঙ্কা করছিল।

— আর পাশের বাড়ির রাজকুমারের কণ্ঠে উদ্বেগ।

— সরকার, সৌভাগ্যক্রমে উইক্সেলবার্জার পরিবারের একজনও বাড়িটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার সময় ঘরে ছিল না— সাগ্রহে সশ্রদ্ধায় উত্তর করল একজন প্রতিবেশী। কেবল তরুণ অ্যাপ্রেন্টিস জো। গৃহস্বামী সপরিবারে বেড়াতে বেরিয়ে যাওয়ায় ও-ই বাড়িটা দেখাশুনা করছিল। বড় ভালো ছেলে ঐ তরুণ জো। হায়! বেচারার কী দুর্ভাগ্য!

বেচারা নিশ্চয়ই মারা পড়েছে। দীর্ঘ চার ঘণ্টারও বেশি ঐ ত্রাণ-কর্মীরা ভূপতিত বাড়িটার মধ্যে দিয়ে পথ করে করে গিয়েও ওর কোন হদিশ পেল না, ওদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হলো। এই নিষ্প্রাণ পাষাণ সমাধির অন্তঃপুরে কেউ কি এখনও বেঁচে থাকতে পারে?

ইতিমধ্যে আয়না-প্রস্তুতকারক উইক্সেলবার্জার বাড়ি ফিরলেন। ক্ষোভে, দুঃখে ও গভীর বেদনায় প্রস্তরীভূত দু'টি চোখ মেলে তিনি সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িটির দিকে তাকালেন— যেখানে তাঁর ছোট কারখানাটি তিনি সুসজ্জিত করে রেখেছিলেন—কাঁচা মালমশলায়, উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীতে— বস্তুত তাঁর নিজের সমস্ত পার্থিব সম্পদে। এই চরম মুহূর্তে সরকারের প্রশ্নের জবাব দেওয়া তাঁর পক্ষে স্পষ্টতই কঠিন ছিল।

— জো কেমন যুবক? ম্যাক্সিমিলিয়ন চতুর্থ জোসেফ জানতে চাইলেন।

— মোটামুটি ভালো ছেলে, আয়না-প্রস্তুতকারক উত্তর দিলেন। ওর নাম ছিল জোসেফ ফ্রায়ানহোফার। জন্মের পরেই ওর মা মারা যান। ওর বাবাকে জানতাম। ষ্ট্রউবিঙ্গের একজন বিখ্যাত কাচ প্রস্তুতকারক। রোগগ্রস্ত স্ত্রী ও এগারোটি সন্তান নিয়ে বড়ই দুর্দশাগ্রস্ত। বাবা-মা দু'জনেই গত হলে জো-এর অভিভাবক ওকে শিক্ষানবিশী করার জন্যে আমার কাছে পাঠালেন। সরকার, ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত আমার কিছুই নেই। কাচ নিয়ে কিছু করার দিকে ওর বিশেষ উৎসাহ ছিল। কিন্তু একটু স্বপ্নবিলাসী ছিল যুবকটি। বার বার আমি ওকে পুস্তকের মধ্যে থাকতে দেখেছি।

— কি ধরণের বই ওর পছন্দ ছিল? রাজকুমার প্রশ্ন করলেন।

— যত রাজ্যের আজে বাজে বই। আয়নার কারিগর উত্তর করল। জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, আরো কি সব, ভগবানই জানেন। ঠিকমত পড়াশুনা চালাতে পারলে জো হয়তো এতদিনে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশুনা করতো। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই আমার কাছে শিক্ষানবিশী করার জন্যে দেয় টাকা ক'টিও আমাকে ও দিতে পারতো না।

শিক্ষানবিশী করার জন্যে অ্যাপ্রেন্টিসকে আবার টাকা দিতে হয় না কি? এই প্রথম, একজন প্রজার সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বাভেরিয়ার শাসক দু'টি ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে, দেশে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত একটি অদ্ভুত প্রথা সম্বন্ধে জানার সুযোগ পেলেন। সেকালে কারখানা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, গৃহিণীর ফাইফরমাস খাটা এবং গৃহস্বামীর ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা প্রভৃতি কাজের সুযোগ লাভের জন্যে তরুণ অ্যাপ্রেন্টিসদের দক্ষ কারিগরকে টাকা দিতে হতো। তারা এই অর্থ ব্যয় করতো কোন বৃত্তি শিক্ষার জন্য, কিন্তু বস্তুতপক্ষে অধিকাংশ সময়ই তাদের ঘরের চাকরের কাজ করতে হতো। আর অর্থ দিতে না পারলে, ছ'বছর বাধ্যতামূলক শ্রমের বিনিময়ে মালিকের ঋণ পরিশোধ করতে হতো।

টর্চের আলোয় উদ্ধারকার্যে লিপ্ত স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে হঠাৎ একটা সোরগোল উঠলো: ঐ তো সেই ছেলেটা। ছেলেটিকে আমরা পেয়েছি।

জোসেফ ফ্রায়ানহোফার তাহলে জীবিত!

ধ্বসে পড়া দেওয়ালগুলো চৌদ্দ বছর বয়স্ক ঐ ছেলেটির চারপাশে একটা

সংরক্ষণের প্রাচীন সৃষ্টি করেছিল। গৃহের পাষাণস্তূপের মধ্যে বদ্ধ হয়েও সে শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার মত প্রচুর বাতাস পাচ্ছিল।

ধীরে ধীরে ওরা তাকে টেনে বার করলো। যদিও সারা দেহ তার থর থর করে কাঁপছিল, তাকে দেখে সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত হয়েছে বলে মনে হলো না। সৌভাগ্যক্রমে ছেলেটা বেঁচে গেছে, একজন ডাক্তার মন্তব্য করলেন। বারবার পরীক্ষা করে বোঝা যচ্ছে, বুকে সামান্য চোট লেগেছে।

ইতিমধ্যে পাশের ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির দরজা থেকে এগারোটি দেহ উদ্ধার করা হলো। একমাত্র তরুণ জোসেফ ফ্রায়ানহোফারই বেঁচে গেছে, দেখা গেল।

বাভেরিয়ার শাসক সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ নন। তা না হলেও অসম্ভবের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কি না দেখার জন্যে তিনি যুবকের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করতে লাগলেন। যুবকটি যেন কোন যাদুবলে বেঁচে গেছে নিশ্চয়ই, এর মধ্যে কোন অবিশ্বাস্য ব্যাপার আছে।

তরুণ জো' এতক্ষণে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছে। এখন সে রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। তোমার সবচেযে প্রিয় জিনিস কি? —রাজকুমার প্রশ্ন করলেন। দ্বিধাহীন কণ্ঠে জো উত্তর করলো— আলো…

সত্যিই তাই। একেবারে এতটুকু শিশু তখন সে। ষ্ট্রউবিঙ্গের কারখানায় শুয়ে থাকতো। ঐ অন্ধকার ঘরে এসে ঢুকতো সূর্যের আলো। ধূলিমলিন কাচগুলোকে উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত করে দেওয়া প্রতিটি সূর্যরশ্মি দেখে সে কত আনন্দেই না তন্ময় হয়ে উঠতো! আলো ছাড়া জীবনই যেন তার কাছে অর্থহীন। যেদিন ওর বাবা ওকে এক কাঠুরের কারখানায় নির্বাসন দিল, সেদিন ও যেন ওটা উপলব্ধি করল। ওরা যখন বুঝতে পারল, ছুতোরের কাজের পক্ষে ও অত্যন্ত দুর্বল আর ওকে ওর কাচের আলোকের পৃথিবীতে ফিরে যাবার অনুমতি দিল, তখন ওর আনন্দ দেখে কে।

— তুমি কি আয়নার কারিগর হতে চাও? রাজা প্রশ্ন করলেন।

— আমি শিখতে চাই।

— আয়না-তৈরি করা? রাজার কণ্ঠ যেন ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে।

— আমি আলোকের সম্বন্ধে আরও জানতে চাই। ওর সম্বন্ধে আমি সব কিছু জানতে চাই। অকুণ্ঠচিত্তে ছেলেটি জানালো।

সবাই হেসেই অস্থির। কেবল আয়না-প্রস্তুতকারক উইক্সেলবার্জার

বিরক্ত হলেন। বইগুলো পড়ে ঐ সব আজে বাজে জিনিসেই ওর মাথাটা ভরে গেছে, রাজা। এখানকার বাজারের একটা দোকান থেকে আলোক-তত্ত্বের ওপর ও একটা বই কিনেছে। কুড়ি বছর ধরে আমি আয়না তৈরি করছি, আমার ক্রেতারাও খুব সন্তুষ্ট, কিন্তু এই ছেলেটি বাজে বইটি ঘরে আনার আগে আমি নিজে আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না।

— যখন আরও কিছু জানতে চায়, ওকে তুমি স্কুলে ভর্তি করে দিলে না কেন? রাজা প্রশ্ন করলেন!

উইক্সেলবার্জার অত্যন্ত বিনীতভাবে জানালেন— ওটা তো প্রথা নয়। যুবক জো প্রাইমারি একটা স্কুলে তো পড়াশুনা করেছে— এর বেশি ও আর কি চায়? পাঠের সময় কোথায়। আয়না-প্রস্তুতকারকের অ্যাপ্রেনটিশে হাতের কাজে পটু হওয়া দরকার, মেধায় নয়।

— তাহলে অদ্ভুত ব্যাপার দাঁড়াবে। দক্ষ কারিগর যেন খুব বিরক্ত হয়েছেন। তার পছন্দমত তাকে স্কুলে পাঠাই, দিনের শেষে সে বইগুলোর ওপর মুখ গুঁজে থাকুক আর আমি কারখানা সাফাই করে মরি।

ম্যাক্সিমিলিয়ন চতুর্থ জোসেফ কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী আয়না-প্রস্তুতকারকই হয় তো ঠিক, কিন্তু ছেলেটার কী দুর্ভাগ্য! রাজা নিজের অনুচরবর্গের মধ্যে একজন মন্ত্রী উটজ্‌শ্লাইডরের কাছে গিয়ে অস্ফুটকণ্ঠে কি যেন বললেন। মন্ত্রী উটজ্‌শ্লাইডর নিজের ব্যাগটি বার করে গুণে গুণে আঠারোটি উজ্জ্বল স্বর্ণ ডুকাট ছেলেটির হাতে দিলেন।

— এ আর কতটুকু! রাজা অনুশোচনা করতে লাগলেন। অর্থের চেয়েও মূল্যবান অন্য কিছু তিনি ওকে দান করতে চান। কিন্তু সম্ভবত অদ্ভুত ছেলেটি এর সদ্ব্যবহার করবে।

— জো, এই অর্থ দিয়ে তুমি কি কিনতে চাও? হাসতে হাসতে তিনি জানতে চাইলেন।

— বই?

— একটা কাচ-কাটা যন্ত্র, শ্রদ্ধেয় রাজকুমার।

— আর যদি সঙ্কুলান হয়, চশমার কাচ-ঘষার একটা যন্ত্র।

এরপর ছেলেটার মনে ভাবান্তর দেখা গেল। সরকারের উপস্থিতি

যেন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ও উইক্সেলবার্জারের দিকে ফিরল। এইসব কেনা-কাটার পর আপনার কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করার মত অর্থ কি আমার বাঁচবে, আমার অ্যাপ্রেন্টিশসিপ ছেড়ে দেবার মত?

রাজপ্রাসাদে ঘোরার সময় রাজাকে চিন্তামগ্ন দেখা গেল।

— উটজ্‌শ্নাইডর, তুমি কি জানতে— তিনি হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলে উঠলেন যে, কাজ শেখার জন্যে আমাদের দেশের যুবকদের অর্থ গুণতে হয়? উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি বলতে লাগলেন— এটা কি আমার অপরাধ হয়েছে যে আমার প্রজাদের সমস্যা সম্বন্ধে আমি এতদিন অনভিজ্ঞ ছিলাম? রাজ্যাভিষেকের পর এই দু'বছর ধরে সৈন্য চলাচল, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ আর শূন্য কোষাগার নিয়ে ব্যস্ত থাকা ছাড়া আমি একটি মুহূর্তও অবসর পেয়েছি? মোট কথা, নেপোলিয়ন ছাড়া আর কি আমাদের অন্য কোন চিন্তা ছিল? আমাদের জীবন থেকে যুদ্ধের বিভীষিকা সরে যাক, যুবক আয়না-প্রস্তুতকারককে স্কুলে পাঠানো সম্ভব হয়ে উঠবে। আমার ইচ্ছে, উটজ্‌শ্নাইডর তুমি ঐ যুবক জোসেফ ফ্রয়ানহোফারের ওপর একটু নজর রাখো— ও কেমন করছে, আমি যেন মাঝে মাঝে জানতে পারি।...

মন্ত্রী উটজ্‌শ্নাইডর নির্দেশ মতই কাজ করতে লাগলেন। জোসেফের ওপর তিনি নজর রেখেছিলেন, পরবর্তী কয়েক বছর যে কারখানাটি জোসেফ তৈরি করেছিল, সেখানে গিয়ে ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন।

— তোমার কি ভাবে জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে, জো? একদিন তিনি প্রশ্ন করলেন।

— কাচ-ঘষার কাজ করে।

— তুমি কি হাত দিয়ে ঐ কাজ করো? তুমি নিশ্চয়ই জানো, ইংলণ্ডে ও-কাজ করার জন্যে একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে। ওটা কিনে নিচ্ছ না কেন?

— অতো টাকা তো নেই আমার, হুজুর!

— যাই হোক, খুব দেরী হয়ে গেছে। নেপালিয়ন ইংলণ্ডের সঙ্গে সমস্ত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে সমন জারি করেছেন। ব্রিটেন ফ্রান্সের বন্দরের সঙ্গে অসহযোগিতা করে ঐ সমনে সাড়াও দিয়েছে। সুতরাং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বাভেরিয়াতে আমাদের নিজেদেরই তৈরি করে নিতে হবে। একথা ঠিক, আমরা এখন নেপোলিয়নের প্রিয় সন্তানদল,

কারণ আমরা ওঁর পক্ষ নিয়েছি এবং তিনি আমাদের রাজকুমারের মাথায় একটা রাজমুকুটও পরিয়ে দিয়েছেন। অগস্‌বুর্গ, লিনডাউ, টাইরল, ভোরার্লবার্গ এখন আমাদের দখলে, কিন্তু প্রতিদানে বিরুদ্ধে নয়, নেপোলিয়নের পক্ষেই আমাদের যুদ্ধে যেতে হবে। যুদ্ধ, যুদ্ধ-ই আনে জো। বাণিজ্যের পক্ষে যুদ্ধ বিপজ্জনক। আমার নিজেরই একটা কাচ-ঘষার যন্ত্র বিশেষ দরকার, কিন্তু কোথাও মিলছে না।

— আপনার নিজের! জো-এর কণ্ঠে বিস্ময়। রাজদরবারে বসে কাচ-ঘষা যন্ত্র নিয়ে আপনি কি করবেন?

উটজ্‌শ্নাইডর হাসলেন। রাজদরবারে নয়। আমি ও-পদ ছেড়ে দিয়েছি— তার কারণ জেনে কি করবে? শুধু এইটুকু জেনে রাখো, সারা য়ুরোপকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বদ্ধ করার কাজে নেপোনিয়নকে সাহায্য করতে করতে আমি এখন ক্লান্ত। তুমি যেমন তোমার মালিকের কাছ থেকে একদা তোমার স্বাধীনতা ক্রয় করার চেষ্টা করেছিলে, সেইরকম আমিও আমার স্বাধীনতা ক্রয় করেছি আমার রাজার কাছ থেকে। আর এখন আমি যেহেতু একজন মুক্ত পুরুষ, আমিও তোমার মতই কিছু করতে চাই। আমার একটা কাচের চোখ তৈরি করার খুব ইচ্ছে, যা দিয়ে মানুষ আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। তুমি কি এ-ব্যাপারে আমার সঙ্গে যোগ দেবে?

— আমি আর কি প্রয়োজনে লাগবো? আলোক সম্বন্ধে এখনও আমি অনেক কিছুই জানি না। লেন্স তৈরীর জন্য কাচ ঘষা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হলে আলোকের প্রতিসরণ ও বিক্ষেপণ সম্বন্ধে সব কিছু ভালোভাবে জানতে হবে। আলোকের প্রতিসরণ সম্বন্ধে স্নেলিয়াসের পরিমাপগুলো জানার যদি একটু সময় পেতাম! গণিত, জ্যামিতি, বিশেষ করে আলোকতত্ত্ব বিষয়ে অধ্যয়ন করার মত অর্থ যদি থাকতো? কিন্তু স্কুলে যে সমস্ত বিষয় বুঝতে পারি নি, সেগুলো আজ আর ধরতে পারছি না। কিন্তু আপনি তো জানেন, এ বিষয়ে আমায় কোন দোষ নেই।

— পড়াশুনা করার জন্যে তোমার যা আবশ্যক, তুমি পাবে। তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, আমি দেখবো। জো, এখন থেকে আমরা অংশীদার। আমার ইচ্ছে বড় বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করি, ঐসব যন্ত্রের সাহায্যে নক্ষত্র

ও আলোকের দূরতম উৎসের রহস্যগুলো উদ্‌ঘাটন করি। আমার লেন্সগুলো ঘসার কাজ থাকবে তোমার ওপর।......

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন যখন বাভেরিয়ন সেনাদলের সাহায্যে এণ্ড্রিয়াস হোফারের নেতৃত্বে সঙ্ঘটিত টাইরলের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিধ্বস্ত করার কাজে লিপ্ত, তখন উটজ্‌শ্নাইডর এবং জর্জ ভন রাইকেনবাক নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যাধ্যক্ষ বেনেডিক্টব্যুরেনের এক প্রাচীন জায়গায় একটা কাচের কারখানা খোলেন। ওখানে খুব শীঘ্রই আলোকের বিভিন্ন উপকরণ তৈরির জন্য একটা বিশেষ বিভাগ খোলা হয়। ওখানে প্রতিসরণ যোগ্য দূরবীক্ষণ তৈরি হতে থাকে। ক্যোনিগসবর্গ, ডোরপেট, বুডাপেষ্ট প্রভৃতি স্থানের বড় বড় মানমন্দিরে ঐসব যন্ত্রগুলোর বিশেষ চাহিদা ছিল। মাত্র বাইশ বছর বয়স হলে কি হবে, উটজ্‌শ্নাইডর এবং রাইকেনবাক জোসেফ ফ্রয়ানহোফারকে এ কাজের ফোরম্যান হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন।

মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ঐ যুবক প্রায় অসম্ভব সাধন করল। এত-দিনকার বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের অভাব তার অনেকখানিই ঘুচে গেল। সারাদিন ধরে সে তার কাচ-ঘষা যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করতো, আর রাত্রিতে সৌভাগ্যবান যুবকরা যা স্কুলে শেখে— সেই গণিত, জ্যামিতি, পদার্থ বিদ্যায় জ্ঞানলাভের জন্যে কঠোর পড়াশুনা করত।

রাতের কঠিন পরিশ্রম আর সীসে পূর্ণ ফ্লিন্ট কাচ নিয়ে ক্রমাগত কাজ করতে করতে তার দুর্বল শরীর আরও ভেঙে পড়ল— কিন্তু ওর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। চোদ্দ বছর বয়সে থিয়েরেক ধ্বংসপ্রাপ্ত ঐ বাড়িতে সেই সব উদ্বেগজনক মুহূর্তগুলো তার শরীরে যে একেবারেই কোন চিহ্ন রেখে যায়নি— এমন নয়। ভেতরে ভেতরে নিশ্চয়ই কোন আঘাতজনিত রোগে সে ভুগেছে। যন্ত্রের ওপর ঝুঁকে পড়ে কাজ করতে করতে রাতে বই পড়তে পড়তে সময় সময় যন্ত্রণায় সে কাৎরেছে।

দুই মালিক— উটজ্‌শ্নাইডর ও রাইকেনবাকের মনে এসব সম্বন্ধে কখনও কোনও সন্দেহ জাগে নি। বরং ও বেশ সুস্থই, ওঁরা মনে করেছেন। সমস্ত অতিরিক্ত পরিশ্রমের ভার বহন করতে সর্বদা ইচ্ছুক থাকায় ওঁরা মনে করেছেন ওর কর্মক্ষমতা কোন অবসাদ মানে না।

কিছুদিন না যেতেই জুবক জো এমন একটা আবিষ্কার করে বসল, যেটা

খুব লাভজনক মনে হওয়ায় দুই মালিক ওকে ওঁদের অংশীদার করে নিতে চাইলেন। নেপোলিয়ন তখনও অপরাজিত। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও মহাদেশীয় অবরোধ অব্যাহত থাকায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থমকে দাঁড়িয়েছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্সের জন্য অপরিহার্য ফ্লিন্ট কাচ তখন ইংলণ্ডেই তৈরি হয়। অথচ ইংলণ্ড থেকে মাল আসছে না। পুরোদমে কাজ চালু হবার আগেই মাঝপথে কারখানটা বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। এই সময় যুবক জো কারখানাটিকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের কাজে এগিয়ে এলো। এখন আলোকের প্রতিসরণ সম্পর্কে তার বেশ জ্ঞান হয়েছে। সবচেয়ে ভালো ব্রিটিশ ফ্লিন্ট কাচেরও যে কতকগুলি বিশেষ খুঁত আছে, জো-এর চোখে তা ধরা পড়েছে। ওর কাচের বিভিন্ন তলগুলোর প্রতিসরণ-সূচকও বিভিন্ন। — বেনেডিক্টবিউরেনের এই কারখানায় এই ত্রুটিমুক্ত কাচ তৈরি করা কি সম্ভব নয়? জো ভাবতে লাগল।

জোসেফ ফ্রায়ানহোফার নিজেই কাচের ফার্মেশ তৈরি করে নিল। দ্বিতীয় দফা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সময় সে একশ' কিলোগ্রাম ওজনের এমন কাচ তৈরি করে বসল যার ভূমি ও উপরিভাগের আলোকের প্রতিসরণ একই দাঁড়াল। সহধর্মবিশিষ্ট কাচ তৈরি হলো, যার সর্বস্তরে আলোকবিষয়ক গুণাগুণ একই রকম। স্বচ্ছ-শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরির পথে আব কোন বাধা রইল না। মধ্যবয়সী কারখানাটা বেঁচে গেল।

নতুন সাত ইঞ্চি দূরেক্ষণ লেন্সের প্রথমটি মিউনিচ মানমন্দিরে প্রেরণ করা হলো এবং প্রস্তুকারকরা ওর থেকে আয় করলেন বাইশ হাজাব ফ্লোরিন। বার্লিন, বন, সেণ্ট্ পিটার্সবার্গ, কীভ ও কাজান থেকে ক্রমাগত অর্ডার আসতে লাগল। উটজ্শ্নাইডর ও রাইকেনবাক আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। আরও বেশী সংখ্যক কর্মী ঐ কারখানায় নিযুক্ত হতে লাগল। আর জো-র কাছ থেকে আরও বড়, আরও উন্নত ধরণের দূরবীক্ষণ যন্ত্র আশা করা হলো।

কিন্তু আশাতীত একটা ঘটনা ঘটল। জোসেফ ফ্রয়ানহোফার হঠাৎ উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন। কারখানার লোকজনদের কাজের তদারক করা দূরে থাক, বিরাট রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকার একেবারে উপরতলার ঘরে ঢুকে পেন্সিল, কাগজ, জ্ঞানগর্ভ পুস্তক ও আলোকের যন্ত্রপাতি নিয়ে মেতে উঠল।

কারখানার লোকজনদের নিজেদের কলাকৌশলের ওপর ছেড়ে দিয়ে এসে

মাঝে মাঝে তার নিজেকে দোষী মনে হতে লাগল। কিন্তু উপায় কী, অন্য-পথ কি? দুর্নিবার আকর্ষণেই তাকে পড়াশুনায় অতি সাজ্ঘাতিকভাবে মন প্রাণ ঢেলে দিতে হয়েছে। আর কারুর ওর ঘরে ঢোকার অনুমতি ছিল না। কেউই জানতে পারল না, জোসেফ কিসের পিছনে ছুটছে। এমনকি, সে নিজেও জানেনা, কিসের জন্য তার এত সাধনা। একমাত্র এইটুকু সে জানত, যে কাজে সে হাত দিয়েছে— দুরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ— তার সঙ্গে কারখানায় তার কাজের কোন সম্পর্ক নেই। দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে সে আরও ত্রুটিহীন কাচ তৈরির কাজে ব্যস্ত, আরও নিখুঁত লেন্স ও শক্তিশালী দুরবীন— উটজ্শ্নাইডরের কাছে তার এই সমস্ত অজুহাত আর সত্য নয়। তাহলে কি কাজে সে ব্যস্ত?

কারখানা থেকে ঘরে ঢোকামাত্রই জো দরজাটা বন্ধ করে দেয়, জানালার পাইন কাঠের শার্সিগুলো ভালো করে নামিয়ে দেয়, তারপর কাটা শার্সির একটা কাঠের লম্বা ছিদ্র দিয়ে মেঘমুক্ত আকাশের রোদ এসে প্রবেশ করে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে, সেখানে ঐ রোদের রেখার ওপর ফ্লিন্ট কাচের একটা প্রিজ্ম রাখা হয়েছে।

প্রিজ্মের সামনে জো বসে থাকত। সেই রঙীন দৃশ্য দেখতে দেখতে জো এত তন্ময় হয়ে পড়ত যে, বার বার দেখেও ওর আশা মিটত না।

যেন কোন যাদুবলে শ্বেতশুভ্র সূর্যের আলো হঠাৎ বর্ণালীর সাতটি রঙে বিচ্ছুরিত হতো। বৃহত্তর অথবা ক্ষুদ্রতর প্রতিসরণ কোণ অনুসারে প্রতিটি আলোকের পাড়ের স্বতন্ত্র স্থান ছিল— ওর শুরুতে লাল আর শেষে বেগুনি।

কিন্তু ইহাই সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। এই কারণেই জো আরও বেশি করে নিজেকে এ-ঘরে আবদ্ধ রাখে নি। অভিনব এক আবিষ্কারের নেশাই ওকে বার বার ঐ ঘরে টেনে আনতো। তার এই আবিষ্কার স্যর আইজাক নিউটনের মত আলোকের বিখ্যাত পর্যবেক্ষককেও বিস্মিত করেছিল। এতো অদ্ভুত ও আশ্চর্যকর এই আবিষ্কার যে তার নিজের ও বিশ্বাস করতে দ্বিধা ছিল।

একদিন যখন জোসেফ ফ্রায়ানহোফার কারখানা ও লোকজনদের ওদের ভাগ্যের ওপর সমর্পণ করে চলে এসেছেন, উটজ্শ্নাইডর ও রাইকেনবাক

অফিস-ঘরে বসে হিসাব নিকাশ করছিলেন। তাঁদের স্পষ্ট ধারণা— কারখানায় এখনকার তুলনায় অনেক বেশী সামগ্রী প্রস্তুত করা যেতে পারে।

— কিন্তু জো'র উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে।— উটজ্‌শ্নাইডর অংশীদারকে নালিশ করে বসলেন। মাঝে মাঝে মনে হয়, ও আমাদের বোকা বানাচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ও নিজের সময়ের ও আমাদের টাকাপয়সার শ্রাদ্ধ করছে। আমাদের অর্থে ও মস্ত বৈজ্ঞানিকের ভূমিকা পালন করছে। অকৃতজ্ঞ ছেলে!

রাইকেনবাক ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন।

— ওর প্রতি তোমার এত কঠোর হওয়া ঠিক নয়। এ-কথা তো ঠিক, একাধিকবার ও আমাদের অমূল্য কাজ করেছে। এবং তুমি তো বিশেষ করে জানো, সে হয়তো নতুন কোন আবিষ্কারের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। তার আবিষ্কার আমাদের জন্যে হয়তো আরও টাকা ও সম্মান আনবে। তার সমধর্ম বিশিষ্ট কাচের কথাটা একবার ভেবে দেখো।

— আমি ভাবছি, ক্যেনিগ্‌সবর্গ মানমন্দির সূর্যবিম্বমাপক ন'ইঞ্চি দূরবীনের জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। এবং ডোপার্ট চাইছে বড় প্রতিসরণ দূরবীন। আমাদের ওগুলো পাঠানো দরকার। কিন্তু জো আবার অদৃশ্য হয়েছে। তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে? ওকে ওরই ঘরে বসে দু'কথা শোনাব।

রাইকেনবাকের কিন্তু মন চাইছে না। কি আর করা। উটজ্‌শ্নাইডর একাই ছুটল।

বন্ধ দরজায় গিয়ে আঘাত করল। বেশ কয়েকবার জোরে আঘাত করতে থাকল। দরজা খুলে গেল। ধীরে ধীরে অন্ধকার অভ্যস্থ হয়ে উঠল ওর চোখ। ও বুঝতে পারল, রঙিন আলো নিয়ে জোসেফের এই খেলার সঙ্গে দূরবীন তৈরির কোন সম্পর্কই নেই।

— জো, এতদিন ধরে তাহলে আমাদের ভুল বুঝিয়ে এসেছ?— উটজ্‌শ্নাইডর ক্রুদ্ধ হয়ে ওকে আক্রমণ করল। তুমি নতুন ধরণের লেন্সের ওপর কাজ করছো— এ-সব তাহলে মিথ্যে?

— আমি মিথ্যে বলি নি— অন্ধকারে জো'র কণ্ঠ শোনা গেল।

— আমি অবর্ণক লেন্স তৈরির ব্যাপারে পরীক্ষা করছিলাম। যে লেন্সে আলোকের বর্ণবিচ্ছুরণ ঘটবে না। পরীক্ষা করে দেখা গেল, এটা সম্ভব।

কতকগুলি প্রিজ্‌মের সমন্বয়, যাদের মধ্য দিয়ে আলোকের প্রতিসরণ হয় কিন্তু রামধনুর সাতরঙে বিশ্লেষণ ঘটে না। এতদিনে আমি বুঝতে পেরেছি, কিভাবে এটা সম্ভব। নিম্ন প্রতিসরণ শক্তিসম্পন্ন উত্তাল ক্রাউন কাচের সঙ্গে উচ্চ প্রতিসরণ সম্পন্ন উচ্চ অবতল ফ্লিন্ট কাচের সমন্বয়ে এটা তৈরি করা যায়। এইভাবে লেন্সগুলো যুক্ত করলে ঐ বিরক্তিকর বর্ণ-প্রান্তগুলি আর তৈরি হবে না।

— চমৎকার জো, উটজ্‌শ্নাইডর সানন্দে ঘোষণা করলেন। এখানে একটু আলো আসতে দাও, তারপরই কাগজ কলম নিয়ে দেখাতে পারবে, কিভাবে তুমি তোমার ভাবনাকে রূপ দিলে। কখন তুমি এ-আবিষ্কারটা করলে।

— কয়েক সপ্তাহ আগে।

— তাহলে তুমি ব্যাপারটা আমাদের কাছে গোপন করে গেছ? জানলে আমরা তো তোমার এই নতুন অবর্ণক লেন্সগুলোকে আমাদের দূরবীনে লাগাতে পারতাম! তোমায় নিয়ে যে কি করি, জো।

—তাহলে আপনাকে সব খুলেই বলি। দয়া করে আমাকে অন্ধকারে কথা বলতে দিন, খুব অদ্ভুত কিছু একটা আপনাকে এখনই দেখাব। আপনি বরাবর আমার উপর সদয় ছিলেন। আবিষ্কারের কথা আমি গোপন রেখেছিলাম। কারণ আমার ভয় হত, আপনি যদি আমাকে ওটা চালাতে বাধা দেন। কিন্তু ঐ রশ্মি যে আমার মাথায় সব সময় ঘোরাফেরা করছে! ওদের কথা চিন্তা না করে যে আমি একদণ্ড কাটাতে পারি না।···

—জো, এখন তুমি সাবালক হয়েছ। আমার মত তুমিও এই ব্যবসায়ে আছ। তোমার কর্তব্য আমাকে টাকা উপার্জনে সহায়তা করা। দীর্ঘ সাত বছর তুমি কাটিয়েছ চিন্তা-ভাবনায়, শিক্ষায়।

— কিন্তু সাত বছরে কি হয়? জো শান্তভাবে উচ্চারণ করল। সম্ভবত ওর মাথায় এই দুর্ভাবনা ছিল যে, এই দুর্বল শরীর নিয়ে ও আর বেশি দিন ওর মন-প্রাণ কেড়ে নেওয়া এই আবিষ্কারের কাজ চালাতে পারবে না।

— হুজুর, আপনি কি আমায় এই স্বাধীনতাটুকু দেবেন না?— জো'র কণ্ঠে কাতর প্রার্থনার সুর।

অবর্ণক লেন্সটা আমি আপনাকে উপহার দিচ্ছি। দূরবীন তৈরী করে যান, আমাকে আমার গবেষণায় থাকতে দিন।···

কি সেই গবেষণা ?

— আমি আপনাকে এখনই তা দেখাব। উটজ্‌শ্নাইডরের হাতটা ধরে কাচের প্রিজ্‌মটা রাখা টেবিলটার কাছে জো ওঁকে নিয়ে গেল।

— ভালো করে দেখুন – জো বলল। রামধনুর যে সাতটা রং আপনার সামনে ছড়িয়ে আছে দেখছেন, ওটা সূর্যের আলো। আপনি নিশ্চয়ই তা জানেন। নিউটনই প্রথম দেখান, যদিও সূর্যের আলো আপাতদৃষ্টিতে সাদা ও একই রকম চোখে লাগে, বস্তুত সূর্যের আলো বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্মির সমন্বয়ে গঠিত। আমার এই কাচের প্রিজ্‌ম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনুসারে ছোট বড় কোণে প্রত্যেক প্রতিসরিত আলোকরশ্মিকে পৃথক করে মিশ্রিত ও সমগ্র আলোক রশ্মিকে ওর বিভিন্ন বর্ণে ভাগ করে দেখিয়েছে। প্রতিসরিত রশ্মিগুলো প্রিজ্‌ম থেকে বেরিয়ে নিজেদের পর পর সাজিয়েছে; প্রতিটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমাদের চোখে বিভিন্ন বর্ণের আকারে ধরা দেয়।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, উটজ্‌শ্নাইডর যেন অতিষ্ঠ হয়ে বাধা দিয়ে উঠলেন।

এ-সবই না হয় সত্যি, কিন্তু শুষ্ক তত্ত্ব এবং এটা আমাদের খুব বেশি এগিয়ে দেবে না। আমরা বিজ্ঞানের সম্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাতে বসি নি, দূরবীন বিক্রি করতে বসেছি।

— কিন্তু আলোক-রশ্মির রহস্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই না থাকলে একজন একটা কারখানার ফোরম্যান হয় কি করে ? ডাই-অপট্রিক লেন্স সম্বন্ধে কাজ করতে করতে আমার এই দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে বর্ণালার বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পরিমাপ করার জন্য আমি বদ্ধপরিকর। আমি বাজে কাজে সময় নষ্ট করি নি। আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি এবং গত কয়েক মাসে সূর্য-রশ্মির বর্ণালীর প্রতিটি বর্ণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সঠিক পরিমাপে সক্ষম হয়েছি।

— বেশ, বেশ, উটজ্‌শ্নাইডর উত্তেজিত যুবকটিকে শান্ত করলেন। আমার বিশ্বাস, তুমি এখন তোমার কৃতকার্যতায় সন্তুষ্ট। তা হলে আমাদের সকলকে এবার ব্যবসার কথা ভুলতে হবে।

— কিন্তু সূর্য-রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাপার সময় আমি কি আবিষ্কার করলাম, তা তো এখনো আপনাকে জানানো হয় নি। লাল বর্ণের আলোর পাড়টার দিকে একবার ভালভাবে তাকান। নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন, চারটে স্পষ্ট কালো রেখা এর মধ্য দিয়ে বরাবর চলে গেছে।

— স্বভাবতই— উটজ্‌শ্নাইডর কোনক্রমে কথাটা উচ্চারণ করলেন।

— না, স্বভাবতই নয়— কারণ আমার আগে কেউই এটা প্রত্যক্ষ করে নি। আমি প্রথম যখন ওদের সনাক্ত করি, তখন আমারই মনে হয়েছিল, কোন দুর্ঘটনা বা আলোকেরই কোন ভোজবাজি নয় তো? পরীক্ষাটা পরের দিন চালানোর জন্যে আমার যেন আর তর সইছে না। কিন্তু আবার ঐ রেখাগুলো ধরা পড়ল। আলোকের ঐ সারিতে ওগুলো আমার নজরে পড়ল— চারটি লালে, একটা কমলা ও হলুদের মধ্যে তিনটি নীলে, একটি পীত বর্ণে সবুজ প্রান্তে আর সবশেষে তিনটি বেগুনীতে। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ একই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল। প্রতিবারই কালো রেখাগুলো ফুটে উঠতে লাগল তাদের নির্দিষ্ট স্থানে। পরীক্ষার কাঠামো পরিবর্তন করেও ওদের অবস্থানের কোন পরিবর্তন আনা গেল না। আমি নিশ্চিত হলাম— আমার ঐ রেখাগুলো সত্যিই আছে আর ওরা আসছে সূর্য থেকে, আমাদের এই পৃথিবী থেকে নয়। ওদের নিয়ে গবেষণা করতে লাগলাম, ভালো করে চেনার জন্যে ওদের এক-একটা অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করলাম। কারণ পরে প্রধান রেখাগুলোর মধ্যে, চুলের মত সরু কতকগুলো রেখাও ধরা পড়ল। সর্বসমেত, এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ' রেখা আমি গণনা করেছি। স্বভাবতই, কেবল সূর্য বর্ণালীর মধ্যেই নয়…

জো'র বক্তৃতা ক্রমশঃ ওঁকে উৎসাহিত করে তুলছিল। ও কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে থেকে জানালার খড়খড়িগুলো খুলে দিল।

এই উন্মুক্ত নক্ষত্রখচিত রাত্রে আপনি একবার আসবেন। — জো বলে চলল। আমি তাহলে দেখাতে পারি, চন্দ্র ও নক্ষত্র থেকে আগত আলোককেও অনুরূপভাবে বিশ্লেষিত করা যায়। চাঁদ ও শুক্র থেকে আগত আলোকের বর্ণালী পর্যবেক্ষণের জন্য আমিও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করেছি। এখন আপনাকে অদ্ভুত কিছু শোনাই। চাঁদের আলোয় আমার রেখাগুলোর অবস্থান সূর্যের আলোর অবস্থানের অনুরূপ। কিন্তু অন্য গ্রহের বর্ণালীর ক্ষেত্রে অনুরূপ নয়। ওর আলোয়ও ঐ রেখাগুলো আছে। সূর্যের বর্ণালীতে নয়, অন্যত্র। কেবল কমলা রঙের পাড়ে ঐ রেখা, যাকে আমি 'D' দিয়ে চিহ্নিত করেছি, একই জায়গায় আছে। ওটা কি বিস্ময়কর নয়?

— আমার কাছে আরও বিস্ময়কর লাগছে, উটজ্‌শ্নাইডর একটু থেমে উত্তর দিলেন যে, একজন তরুণ আলোকের কালো রেখাগুলোর সন্ধানে সময় নষ্ট করছে। এখন বুঝতে পারছি, সকালে তোমায় অত ক্লান্ত, অবসন্ন লাগে কেন? নক্ষত্র-আলোকের রেখাগুলো গণনার কাজে যদি রাতের পর রাত কাটাতে হয়, তাহলে এ আর আশ্চর্য কি? এখন বলো তো, এইগুলো অনুসন্ধান করে তুমি কি পাবে?

— তা আমি জানি না, জো উত্তর করল। তাছাড়া ঐ রেখা গণনার কাজও আমি ছেড়ে দিয়েছি। ওদের অর্থ উদ্ধারের কাজেই আমি এখন ব্যস্ত। রঙীন আলোর মধ্যে ওরা কোত্থেকে আসে—আমাকে খুঁজে বার করতে হবে। ওর জন্য আমার কিছু সময়ের প্রয়োজন। আমাকে একটু অবসর দিন। জো'র কণ্ঠে কাতর প্রার্থনা। আমার নিজের জন্যে আমি কোন সময়ই পাই নি। ছোটবেলায় এতো গরীব ছিলাম যে স্কুলে পড়তে পারিনি, তারপর আমাকে মালিকের জন্য তার আয়নার কারখানায় কাজ করতে হয়েছে। আর এখন আমাকে দূরবীন তৈরি করতে হচ্ছে যাতে অন্যেরা আকাশকে ভালো করে নিরীক্ষণ করতে পারে। আলোর রহস্য ও রশ্মির গোপন কথা শোনা থেকে আমায় বাধা দেবেন কেন? সূর্য থেকে, নক্ষত্র থেকে এই রহস্যপূর্ণ আলোক রশ্মিগুলো আমার কাছে নেমে এসেছে, আমি তাদের আবিষ্কার করব বলে, ব্যাখ্যা করব বলে।

— তুমি তাহলে কেমন ভাবে জীবন নির্বাহ করবে, জো? ঐ রেখাগুলো বোঝার কাজে সময় নষ্ট করলে কি তোমার পেট ভরবে? তুমি কি ভাবছো দূরবীন তৈরি না করে, এখানে বসে বসে বর্ণমালার বর্ণানুসারে ঐ কালো রেখাগুলোর নামকরণ করে যাবে আর আমি ও রাইকেনবাক এতই বোকা যে লাভের থেকে তোমাকে তোমার ন্যায্য প্রাপ্য দিয়ে যাব? জো শোনো, যেহেতু তুমি অবর্ণক লেন্স তৈরি করছো, আমি এবার তোমার ওপর নির্দয় হতে চাই না। কিন্তু ঐ কালো রেখাগুলোর ব্যাপারটা শেষ হওয়া দরকার। হয় তোমার মন-প্রাণ ঐ দূরবীন তৈরির কাজে ঢেলে দাও অথবা কাজ দেখে নাও। তুমি যা ভাল বোঝ, তাই কর।

কিন্তু সেই মুহূর্তে জোসেফের পক্ষে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানানো সম্ভব

হলো না। হঠাৎ ও অজ্ঞান অবস্থায় চেয়ার থেকে পড়ে গেল। ওর মুখ থেকে রক্তের একটা সরু রেখা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আরো একবার ম্যাক্সমিলিয়ন প্রথম জোসেফ - বর্তমানে যিনি রাজা হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করেছেন— জো'র ভবিষ্যতের কথা ভাবলেন। দীর্ঘদিন হলো উটজ্‌শ্নাইডর মন্ত্রীপদে ইস্তফা দিয়েছেন। তবু তাদের যৌথ পরিকল্পনা সম্বন্ধে রাজাকে জানানো তিনি কর্তব্য মনে করলেন।

তিনি জো'র চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। তারপর বেনেডিক্টবিউরেন থেকে বাভেরিয়ার রাজধানীতে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা নিয়ে কথাবার্তা চালানোর জন্যে মিউনিচের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

শেষে নেপোলিয়নের পরাজয় ঘটল এবং তিনি সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হলেন। তাঁর প্রাক্তন পরামর্শদাতা উটজ্‌শ্নাইডরের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর জন্যে রাজা অবসর পেলেন। নিজের জীবন ও সমৃদ্ধির কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যে তরুণটি উজ্জ্বল আলোকের অন্তরালে লুক্কায়িত কালো রেখার অনুসন্ধানে লিপ্ত, তাঁর সেই অন্যতম শিষ্য জোসেফ ফ্রায়ানহোফারের কাহিনী শোনার জন্য রাজা বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

— তুমি বলছ, ঐ যুবকটি আমার অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এ একটা জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ পাঠাতে খুব উৎসুক! কিন্তু মনে কর, নিবন্ধটা যদি একেবারেই অর্থহীন হয়, উটজ্‌শ্নাইডর, তা হলে তুমি ও আমি একেবারে বোকা বনে যাব। আচ্ছা, ওর নিবন্ধটার নাম জানো?

উটজ্‌শ্নাইডর পকেট থেকে এক খণ্ড কাগজ বার করল।

— যদিও আমি বহুদিন হলো দূরবীন তৈরির কাজে নিযুক্ত আছি, যদিও আলোক-বিদ্যা সম্বন্ধে আমার খুব বেশি জ্ঞান নেই, ওর নিবন্ধের নামটা আমার ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। রশ্মি'র বিপরীত ক্রিয়া ও বিভাজনের ফলে আলোকের নতুন রূপান্তর, এরকম কিছু একটা হবে জো'র নিবন্ধের নাম – আমি জোসেফ ফ্রায়ানহোফারের কথা বলছি।

— আমি তো এর কোন অর্থই খুঁজে পাচ্ছি না, রাজা বললেন। তুমি বলতে পার, ওর অর্থ কি? প্রথমে ওর ঐ নিবন্ধটা আমার অ্যাকাডেমির ভদ্রলোককে খুব গোপনে দেখাব। তাঁরাই বিবেচনা করে

দেখুন, এই ফ্রায়ানহোফার লোকটা কেমন। যদি সে পাগলাটে ধরনের হয়, আমরা ওকে একটা গ্র্যাচুয়িটি পেনশন দিয়ে বিদায় করে দেব।

— মহারাজ, ও যদি বিজ্ঞানী বলে বিবেচিত হয়, তা হলে ?

— একজন বিজ্ঞানী ? ম্যাক্সিমিলিয়ান প্রথম সন্দেহসূচক মাথা নাড়লেন। তুমি কি সত্যি সত্যি মনে কর, তা সম্ভব ? ভেঙে পড়া বাড়ির ধ্বংসাবশেষ থেকে আমরা যাকে টেনে বার করেছিলাম, সেই ছেলেটি একজন বিজ্ঞানী ? স্কুলে শিক্ষা না পাওয়া একটা গরীব ছোকরা ? যা হোক উটজ্‌শ্নাইডর, আমি জানাই, ফ্রায়ানহোফার যদি আলোক সম্বন্ধে সত্যিই কিছু জেনে থাকে, আমি তা হলে তাকে অধ্যাপক করব। ওকে আমার অ্যাকাডেমির একজন সভ্য করব, সম্মানিত করব……

একবছর পরে জোসেফ ফ্রায়ানহোফারের নিবন্ধটা মুদ্রিত হয়ে বেরুল। গ্রন্থকার শুধু রাজা কর্তৃক সম্মানিত হলেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হলেন, এমন কি রাজকীয় সম্মানে ভূষিত হলেন।

এখন থেকে জো'র নাম হলো জোসেফ ভন ফ্রায়ানহোফার এবং সমস্ত বিদ্বান মহলে তিনি ঐ নামে পরিচিত হলেন। জীবন যাপনের জন্যে তাকে আর দূরবীন তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকতে হলো না, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ন্যাচারাল সায়েন্স কালেক্শন অব দি অ্যাকাডেমির কিউরেটর হিসেবে তাঁর বেশ ভালোভাবেই সময় কাটতে লাগলো। বর্ণালীর কালো রেখার ওপর ওঁর পর্যবেক্ষণ— যার সঙ্গে ওঁর নাম জড়িত হয়ে গেল— আর বেশিদিন চালানোর দরকার হলো না ; সরকারীভাবেই ঐ পর্যবেক্ষণ চালানো হলো জনগণের সামনে, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সুসজ্জিত গবেষণাগারে।

তবুও জো'র মনে সুখ ছিল না। যদিও দীর্ঘদিন অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর আগের রোগ-যন্ত্রণা বার বার প্রকট হয়ে উঠছিল, তবুও ভগ্ন-স্বাস্থ্যর জন্য তাঁর অতো মাথা ব্যথা ছিল না। ঐ রেখাগুলোই তাঁকে বার বার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলছিল। সূর্য ও নক্ষত্রের আলোকের বর্ণালীতে ওদের অবস্থিতি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে সকল বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে মিউনিখের কাচ-ঘষার ফোরম্যান জোসেফ ফ্রায়ানহোফারের এই আবিষ্কার মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু নক্ষত্র-ভূষিত বক্ষসম্পন্ন এই সম্মানত অধ্যাপক জো ঐ রেখাগুলোর রহস্য উদ্‌ঘাটন

করতে পারেননি— ধরতে পারেননি, কোথা থেকে ওরা আসে, ওদের অর্থই বা কি।

তাঁর যুক্তিতে আলোকের অনুপস্থিতিই অন্ধকার। ঐ কালো রেখাগুলো, তাহলে সূর্যের বর্ণালীতে নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মির অনুপস্থিতি সূচনা করে। কিন্তু ঐ সুনির্দিষ্ট স্থানেই ওরা বার বার হারিয়ে যাবে কেন, বার বার একই স্থানেই বা ওদেব অবস্থান ঘটবে কেন?

চিন্তা ভাবনায় একেবারে ডুবে গেল জো। বছরের পর বছর গড়িয়ে গেল, জো'র সমস্ত কর্মশক্তিও ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে গেল কিন্তু হায়! সমস্যাটার সমাধানের পথে এক ধাপও তিনি অগ্রসর হতে পারলেন না।

অবশেষে একদিন ওঁর মৃত্যু ঘটল। দিনটি ছিল ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন। আলোকের অভিসারে যাত্রা করার জন্যে প্রকৃতি জোসেফ ফ্রায়ান-হোফারকে মাত্র উনচল্লিশ বছর সময় দিয়েছিল। এবার তিনি ছায়াচ্ছন্ন পৃথিবীতে হারিয়ে গেলেন। ওঁর সেই কালো রেখাগুলো রহস্যের ঘোমটায় আত্মগোপন করে রইল!

উৎসবের মধ্য দিয়ে সসম্মানে জো'র শেষকৃত্য সুসম্পন্ন হলো। বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা ওঁর শবাধার সযত্নে বহন করে নিয়ে এলেন, রাজা নিজেও প্রতিনিধিত্ব করলেন। জো'র সমাধি-স্তম্ভে উৎকীর্ণ করা হলো— উনি নক্ষত্র-লোককে আমাদের আরও কাছে এনে হাজির করেছেন। কথাটা আলোকের পর্যবেক্ষক বিজ্ঞানী জোসেফ ফ্রায়ানহোফারের পক্ষে যেমন সত্য, শক্তিশালী দূরবীন-নির্মাতা তরুণ জো'র বেলাও তেমনি সত্য।

শেষকৃত্য সম্পন্ন হবার পরের দিন রাজা উটজ্‌শ্নাইডরের কাছে লোক পাঠালেন। সত্যিই আমি বিশেষভাবে মুগ্ধ — এক লিপিতে ম্যাক্সমিলিয়ান প্রথম জোসেফ ওঁকে জানালেন।— আমার অ্যাকাডেমির সভ্যদের মতে জোসেফ ফ্রায়ানহোফার একজন প্রতিভাধর বিজ্ঞানী। আমায় খুলে বল তো, তাঁর অমূল্য জীবন সংরক্ষণের জন্য আমি কি কিছু করতে বাকি রেখেছি!

— নিজের কাছে আমারও সেই প্রশ্ন, মহারাজ। ওঁকে আমি যখন আমারই স্বার্থে কারখানার কাজে লাগাই, তখন আমি কি ওঁর প্রতি খুব কঠোর মনোভাবাপন্ন ছিলাম— ভাবতে ভাবতে সারা রাত আমার ঘুম হয় নি। কিন্তু বারবার মনের কাছে প্রশ্ন করে এই উত্তর পেয়েছি— আমরা কিছুই উপেক্ষা

করি নি। যুবক জো নিশ্চয়ই জানতো, মৃত্যুকীট ওর মধ্যে রয়েছে। সেই জন্যই ও সময়ের অপচয় করতে চায় নি। অল্পকালের মধ্যে ও বহু কাজ সম্পন্ন করে গেছে। ওর আর কিছু দেবার ক্ষমতা ছিল না।

সে নিজেও তা জানতো। 'উটজ্‌শ্নাইডর' ওর সঙ্গে শেষ দেখা হবার সময় বলেছিল—এখন মৃত্যু হলে আমার চিন্তা নেই, ঐ রেখাগুলোর রহস্য আমার উদ্ধারের বাইরে।

— কিন্তু এটা কি মেনে নেওয়া যায়, রাজা প্রশ্ন করলেন— নিজের আবিষ্কৃত জিনিসটা নিজেই উদ্ধার করতে পারবে না ?

— তা হতে পারে বৈ কি। আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে যুবক জো আমাকে প্রায়ই বলতে— ঐ রেখাগুলো সূর্যের রহস্য। এই পৃথিবীর একজন বাসিন্দা ওর রহস্যের ঘোম্‌টাটা উন্মোচন কি করতে পারে ?

তেত্রিশ বছর পরে হাইডেলবার্গে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তের দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিভাগের অধ্যক্ষ গুষ্টাভ রবার্ট কির্কচফ নিকটবর্তী রসায়ন বিভাগের সহ-অধ্যাপক ববার্ট উইলহেম বুনসেনকে বার্তা পাঠিয়ে জানালেন, ওঁর ওখানে এসে একবার দেখা করলে ভাল হয়। অতি সাধারণ একটা লৌকিকতার পত্র কির্কচফ গবেষণাগারের ব্যবস্থাপক পথের অপর দিকে বয়ে নিয়ে গেল। দীর্ঘদিন দুই বিজ্ঞানী পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রায়ই একে অন্যের সঙ্গে পরস্পরের গবেষণাগারে দেখা সাক্ষাৎ করেন। এই যথেষ্ট, কারণ ওদের ঘনিষ্ঠতার জন্যে ছাত্রমহলে প্রায়ই বিদ্রূপাত্মক অনুযোগ শোনা যেত। হাডেলবার্গে কোথায় যে পদার্থবিদ্যাব শেষ আর রসায়ন বিদ্যার শুরু, বলা অসম্ভব।

বেশবাসের পরিবর্তনের জন্যে অপেক্ষা না করে বুনসেন তখনই ছুটলেন পদার্থ বিভাগের দিকে। কির্কচফ তাঁর জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু তিনি পদার্থবিদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সুসজ্জিত নিজের গবেষণাগারে ছিলেন না, লেখার একটা বড় টেবিল আর কয়েকটা চেয়ারে সজ্জিত নিজের ছোট্ট দপ্তরে ছিলেন।

— আজকের এই লৌকিকতার কারণ কি, গুষ্টাভ ? বুনসেন জানতে চাইলেন।

— আমার সঙ্গে একটু বেরুবে, রবার্ট ? কির্কচফ উত্তর দিলেন।

— এই কাজের সময়? জানো না, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমার বক্তৃতা আছে?···

— তোমার সহকর্মীকে একবারের জন্যে পাঠাও না। তোমাকে আমার প্রয়োজন। আমার প্রস্তাবিত এই ছোট্ট যাত্রা তোমার নিজস্ব জগতেরই।

— কিন্তু কোথায় চলেছ, জানতে পারি?

— সূর্যের কাছে, রবার্ট।

বুনসেন উশখুশ করে উঠলেন। সূর্য তো আমার জগৎ নয়। তোমার তা জানা উচিত। বরং এক জ্যোতির্বিদ্‌কে সঙ্গে নাও।

রাসায়নিক মৌল সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদ্ কি জানে? কিন্তু আমি তোমাকে আর বেশি পীড়াপাড়ি করতে চাই না।

— জানালা দিয়ে সে সূর্যের প্রতি নির্দেশ করল। স্বচ্ছ নির্মল আকাশে আর বেশি পীড়াপীড়ি করতে চাই না।

— পৃথিবী থেকে তা কেমন করে জানব? হতচকিত চিত্তে বুনসেন জানাল, ঐ অগ্নিপিণ্ডকে কে রাসায়নিক বিশ্লেষণের মধ্যে আনতে পেরেছে? তাছাড়া তুমি তো জানো, সূর্য এখান থেকে প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত এবং ওর ভেতরের তাপমাত্রা লক্ষ লক্ষ ডিগ্রী। এর রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে কোন্ বিজ্ঞানী আচ করবে?

— তুমিই, আর কেউ নয়, রবার্ট।

— আমি?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমিই। আমি ঠিকই বলেছি। তুমি তো আমাদের সেই চমকপ্রদ গ্যাসবার্ণারটা দিয়েছ। বুনসেন বার্ণার বলেই সকলে ওটা জানে। ওটার সাহায্যে আমরা তো এখন নিম্ন আলোকপ্রভা অথচ উচ্চ তাপমাত্রা সম্পন্ন শিখা সৃষ্টি করতে পারি। আর তুমি কি বার বার দেখো নি যে, বিশেষ বিশেষ খনিজ লবণ ওর শিখার সম্মুখে রঙের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে?

— ঠিক কথা গুস্টাভ। কিন্তু তোমার এ-সমস্তই আমাদের গবেষণাগারের কারিগরকে বলা উচিত। বার্ণার আবিষ্কারের সমস্ত কৃতিত্ব ওঁরই পাওয়া উচিত। সাত বছর আগে সে-সময় তুমি অবশ্য এখানে ছিলে না। তুমি তখনো ব্রেসলাউতে। সমস্ত ব্যাপারটা তোমাকে জানানোর কথা আমার বার বার মনে হয়েছে, কারণ বার্ণার সম্বন্ধে অনেক আজগুবি কথা রটেছে।

কিন্তু আসলে এক্ষেত্রেও প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী হিসেবে কাজ করে। তুমি জানো, হাইডেলবার্গে গ্যাসবাতির প্রচলন হয়েছে এবং আমার নতুন শিক্ষা কেন্দ্রেও গ্যাসের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু বার্ণারগুলো তেমন ভালো নয়। উজ্জ্বল আলোক শিখায় ওরা ভালই জ্বলে, কিন্তু খুব ঝুল হয়, উত্তাপও তেমন হয় না। আমি ওর সংস্কার সাধনের জন্যে উঠে-পড়ে লাগলাম। ওর মধ্যে কোন যাদু ছিল না। জ্বালানোর আগে বাতাসের সঙ্গে গ্যাসটাকে ভালোভাবে পরিমিতি রেখে মিশিয়ে নিতে হয়। ওটাই সমস্ত রহস্য। আমি বৈজ্ঞানিক সমস্যাটা আমাদের কারিগর দেশাগার হাতে ছেড়ে দিই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি সে-ই উদ্ভাবন করে— বাতাসের মিশ্রণের নিয়ন্ত্রণকারী দুটো ছিদ্র-ওলা 'কলারটা' ঐ তৈরি করে। কিন্তু এসব কথাই আমাদের বিষয়ের বাইরে। কেবল অপর একজনের কৃতকার্যতার সম্মান আমি নিতে চাই না। আমরা কি নিয়ে যেন শুরু করেছিলাম?

— সূর্যকে নিয়ে, বরং রাসায়নিক উপায়ে সূর্যকে জানার জন্যে আমরা শুরু করেছিলাম।

— আমার বার্ণারকে নিয়ে?

— ভালো কথা, আমাদের বোধহয় আরও কয়েকটা জিনিসের দরকার হবে। কিন্তু এটা তোমার বার্ণার নিয়ে আমাদের যৌথ কাজ। ঐ বার্ণারই আমাদের পথ দেখিয়েছে— সূর্যের দিকের পথ। আমিও একটা উপকরণ তৈরি করেছি, সেটা আমাদের যাত্রাপথে সাহায্য করতে পারে। আমি এখনই তোমাকে আমার বর্ণালী-নিরীক্ষকটা দেখাব। তার কারণ, আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, এক্ষেত্রে একজন পদার্থবিদের একজন রসায়নবিদের সাহায্য দরকার হয়। আমরা দু'জন একত্রেই আমি যা খুঁজছি, তার সন্ধান পেতে পারি।

— আর সেটা হলো? বুনসেন বেশ উত্তেজিত।

— আমি তোমায় বলেছি, কিন্তু তোমার বিশ্বাস হয় নি। সূর্যের উদ্দীপ্ত বাষ্পমণ্ডলের সংগঠন জানার জন্যেই আমি চেষ্টা করছি।

— একটু পরিষ্কার হওয়া যাক, গুস্তাভ। একথা ঠিক যে, আমরা অগ্নি-শিখার বর্ণক্রম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছি। উদ্দীপ্ত গ্যাস থেকে নির্গত রশ্মিমালার ওপর রঙিন কাচের খণ্ড ধরে দেখার মধ্য দিয়ে আমাদের শুরু। তারপর তোমার মধ্যে ঐ গ্যাসগুলো আলোকের প্রিজ্‌মের

মধ্য দিয়ে দেবার অভিনব ভাবনা দেখা দেয়। বার্ণারের শিখায় বাষ্পীভূত করার সময় কতকগুলো ক্ষার ধাতুর ও ক্ষারযুক্ত মৃত্তিকার বর্ণালীর মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কতকগুলো রেখার অস্তিত্ব প্রমাণ করতেও আমরা সফলকাম হই। প্রত্যেক মৌলের যে নিজস্ব বর্ণালী আছে— আমাদের এই ধারণা বাস্তবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতএব আমরা শিখার বর্ণালীর মধ্য থেকে উজ্জ্বল রেখাগুলো সনাক্ত করে পদার্থের রাসায়নিক প্রকৃতি নির্ণয়ে সমর্থ হই। গুষ্টাভ, এই সমস্তই ঘটনা। প্রত্যেক শিখার বর্ণক্রমের মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য থাকায় আমরা এখন থেকে বাষ্পের মধ্যে রাসায়নিক মৌলের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার অস্তিত্বও নির্ভুলভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হই। কিন্তু আমাদের বিষয়ে ফিরে এলে প্রশ্ন ওঠে— এ-সবেরই সূর্যের সঙ্গে কি সম্পর্ক?

— বর্ণালীর উজ্জ্বল রেখাগুলো সম্বন্ধে এবং বিভিন্ন মৌলে ওদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে তুমি আলোচনা করছিলে। কিন্তু সৌর বর্ণালীর কালো রেখাগুলোর ব্যাপার কি?

— ফ্রায়ানহোফার রেখাগুলোর? বুনসেন প্রশ্ন করলেন। ওদের ব্যাপারটা কি? ওদের আবিষ্কারকের ওগুলো নিয়ে বড্ড মাথাব্যথা ছিল। ঐ রেখাগুলোই হয়তো ওর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে। ঐ সমস্তটাই ঘটেছিল একপুরুষ আগে— কিন্তু এপর্যন্ত কেউই ঐ রেখাগুলোর সমস্যা সমাধান করতে পারে নি। সন্দেহ হয়, কোনদিন ওগুলোর সমাধান হবে কি না!

— মনে কর, ঐ রেখাগুলোর কিভাবে উদ্ভব হলো, আমি যদি তোমাকে জানাই! যদি আরো জানাই, ঐ কালো রেখাগুলো তোমার মত বিশ্লেষক রসায়নবিদ্‌কে সূর্য-যাত্রায় রক্ষা করবে?

— কি বললে? উত্তেজনায় বুনসেনের কথা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। কির্কচফের কাছ থেকে রহস্যটা উদ্ধারের জন্য বুনসেন ওকে চেপে ধরল। ভগবানের দোহাই, বল তো ব্যাপারটা কি?

— তোমাকে আর একটু ধৈর্য ধরতে হবে— কির্কচফ ওকে সংযত করার চেষ্টা করল। তোমার মত আমিও অপরের কাজের খ্যাতি নিজে আত্মসাৎ করতে চাই না। সেইজন্যে আমার আগে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা কি আবিষ্কার করে গেছেন, সংক্ষিপ্ত আকারে তোমায় তা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তাঁদের অগ্রণী ভূমিকা ছাড়া আমি কিছুই করতে পারতাম না।

— বেশ বেশ, খুব সংক্ষেপে বল।

— তা হলে ফ্রায়ানহোফারকে বাদ দেওয়া যাক— তুমি ওঁর সম্বন্ধে সবই জানো। কির্কচফ তাঁর ছোট বক্তৃতা শুরু করলেন।— কিন্তু অন্য আরও অনেক চিন্তা করতে শুরু করলেন, সূর্য থেকে আগত আলোকে কতকগুলি নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মির অথবা বলা যেতে পারে, বর্ণের অনুপস্থিতির কারণ কি? কারণ এই রশ্মিগুলো নিশ্চিতরূপে বর্ণালীর সেই সব স্থানের বর্ণ প্রকাশ করবে, যেখানে প্রকৃতপক্ষে আমরা কালো কালো রেখা অর্থাৎ ফ্রায়ানহোফার রেখা দেখি। অতএব সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হলো— যা তুমি অবশ্যই জানো— ঐ বিশেষ রশ্মিগুলো সূর্যে অবস্থান করে না— ওরা ওখানে অনুপস্থিত।

— এখন রবার্ট, একদিন আমার ঐ ব্যাখ্যায় কেমন সন্দেহ জাগল। আর তুমি জানো, সন্দেহ থেকেই বিজ্ঞানে অনেক আবিষ্কারের জন্ম। আমি যা বলছিলাম, আমার মনে প্রশ্ন জাগল ঐ অপহৃত বর্ণ বা রশ্মিগুলো পথে কোথাও হারিয়ে যায় নি তো— পৃথিবীতে নেমে আসার পথে কোথাও!

— কেমন করে তোমার কল্পনায় এলো যে, ওরা হারিয়ে গেছে— উত্তেজনা চাপতে না পেরে বুনসেন প্রশ্ন করে বসলেন।

কির্কচফের কিন্তু কোন ভাবান্তর দেখা দিল না। শান্তভাবেই ও বক্তৃতা দিয়ে চলল।

—প্যারিসে, উনি বলতে লাগলেন— লিওঁ ফুকো নামে প্রায় সবজান্তা ধরণের এক পদার্থবিদ্ ছিলেন। একটা কাগজের বিজ্ঞান বিভাগের সম্পাদক হিসেবে তিনি কাজ শুরু করেন, তারপর স্থানান্তরিত হন সোরবোনে এবং ঘটনাক্রমে তিনি প্রসিদ্ধ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সে যোগদান করেন। আলোকের গতি পরিমাপের একটি বিশেষ ব্যবহারযোগ্য বিধি প্রনয়ণের জন্য আমরা পদার্থবিদেরা তাঁর কাছে ঋণী। এর কিছুদিন আগে সদ্য আবিষ্কৃত আলোকচিত্রের ওপর এই অস্থির মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানী কাজ করতে থাকেন এবং এই নতুন কলাটি সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদান রেখে যান। আরও কিছুদিন পরে, তুমি সম্ভবত জানো— ফুকো পরীক্ষা করে দেখান যে আলোক-রশ্মিরা বিশেষ অবস্থায় পরস্পরকে সংহার করতে পারে— যেমন দেখা যায়, যখন এক তরঙ্গ শৃঙ্গের রশ্মি সমান তরঙ্গ বিশিষ্ট অপর রশ্মির সঙ্গে মিলিত হয়। যদি এই ধরনের দুটো তরঙ্গকে জলে পরস্পরের ওপর উপস্থাপন করা হয়,

তা হলে জলে কোন কম্পন হবে না। শব্দ-তরঙ্গের ক্ষেত্রে অনুরূপ উপস্থাপনের ফল হবে নিস্তব্ধতা। আমাদের পরীক্ষার এই বিশেষ ক্ষেত্রে ফল হয়েছে আঁধার। ফ্রায়ানহোফারের রেখাগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে করতে এই সব কথাই আমার মনে হয়েছে।

— তা হলে ?

— অতএব আমি পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে দিলাম। রবার্ট, আমায় স্বীকার করতে হবে, এক্ষেত্রে তোমাকে আশ্রয় করেই আমার পরীক্ষা নিরীক্ষা। আমার ভিত্তি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত না হয়ে আমি কাউকেই এ-কথা জানাতে চাই নি। কিন্তু এখন আমি নিশ্চিত। তোমার বার্ণারের সাহায্যে এইটুকু আমি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি। আলোকের উৎস থেকে যদি রশ্মিগুলো উদ্দীপ্ত গ্যাসের মধ্য দিয়ে পারাপার করে, ঐ রশ্মিগুলোর কিছু কিছু অংশ ঐ গ্যাসে শুষে নেয়।

— কিন্তু কোঁন্ কোন্ অংশ ? বিশেষ রশ্মি ? না এর সমস্তটাই দুর্ঘটনা…?

— না রবার্ট, এর মধ্যে কোন দুর্ঘটনা নেই। আমি যা আবিষ্কার করেছি, তা হলো একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। যখন এক গুচ্ছ আলোক উদ্দীপ্ত গ্যাসের মধ্যে দিয়ে যায়, তখন ঐ গ্যাস সেইসব রশ্মিগুলোই শুষে নেয়, যেগুলো জাজ্বল্যমান আলোকের উৎস হিসেবে ঐ গ্যাস নিজেই বিকিরণ করে। আলোকের বিকিরণ ও বিশোষণ সম্পর্কিত আমার নিয়মটি হলো, সংক্ষিপ্ত আকারে এই রকম— তাপমাত্রার পরিবর্তন না ঘটলে আলোকের নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে প্রত্যেক পদার্থের বিকিরণ ক্ষমতা ও বিশোষণ ক্ষমতার অনুপাত একটি নির্দিষ্ট মান।

মুহূর্তের জন্য বুনসেন যেন বজ্রাহত হয়ে রইল। তারপরই সে চিৎকার করে উঠল— এ যে বিস্ময়কর, গুষ্টাভ। স্বভাবতই, এই উত্তেজনার মুহূর্তে আমি বিচার করে উঠতে পারছি না, রসায়ন ক্ষেত্রে তোমার এই আবিষ্কারের প্রকৃত তাৎপর্য, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, তুমি এই আবিষ্কারের দ্বারা দীর্ঘ-দিনের এক অবরুদ্ধ দোরের চাবি-কাঠিটি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছ। এবার যদি আমরা ওটা উন্মুক্ত করে ওর ভেতরে হেঁটে যেতে পারি…।

— তা হলে আমরা সরাসরি সূর্যে গিয়ে পৌঁছবো।— কির্কচফ কথা

প্রায় শেষ করল। কিন্তু আমার আবিষ্কারের ফলিত প্রমাণ দেখানোর জন্যে গবেষণাগারে তোমাকে নিয়ে যাবার আগে আমাদের কল্পনা করে নিতে হবে যে আমরা সূর্যের অভিসারে যাত্রা করছি। প্রথমে মনে করো, জোসেফ ফ্রায়ানহোফারকে। সূর্যের বর্ণালীতে হলুদ ও কমলা রঙের ঠিক প্রান্তসীমায় তিনি তাঁর ঐ দুটো কালো রেখা লক্ষ্য করেছিলেন। উনি ওদের ডি-১ ও ডি-২ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এবার বিভিন্ন বর্ণক্রমের ওপর আমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা চিন্তা করা যাক। তোমার কি মনে আছে যে, আমরা যখন সোডিয়ামকে বাষ্পীভূত করি, তোমার বার্ণারের শিখায় আমরা সোডিয়ামের বৈশিষ্ট্য দুটো হলুদ রেখা দেখতে পাই! আর কী আশ্চর্য, ঐ হলুদ রেখা দুটো ঠিক সেই জায়গায় দেখা যায়, যেখানে ফ্রায়ানহোফার সৌর বর্ণালীতে ঐ কালো রেখাগুলো প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে।

— বেশ, তারপর আমি আর এক ধাপ এগিয়ে গেলাম! আমি বর্ণালীর হলুদ অংশে সোডিয়ামের বিশেষ রেখা সূচিত করে এমন এক ঝলক আলোককে উদ্দীপ্ত সোডিয়াম বাষ্পের মধ্যে দিয়ে চালিত করলাম। এবার দেখ, হলুদ রেখার পরিবর্তে বর্ণালী কেবল কালো কালো রেখা সূচিত করছে! পতিত আলোক রশ্মি বিশোষিত হয়ে গেছে — কারণ প্রতিবন্ধক গ্যাস নিজেই আলোকের উৎসে ঐ একই বর্ণক্রম উৎপাদন করছে। অতএব আমি প্রমাণ করে দেখলাম যে, কেবল বিকিরণ বর্ণক্রমই নয়, বিশোষণ বর্ণক্রমও আছে। এর অর্থ দাঁড়াল, বর্ণালীতে কয়েকটি বর্ণের অনুপস্থিতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসা যায়।

— আমি সবে দেখতে শুরু করেছি, বুনসেন সানন্দে ঘোষণা করলেন। কির্কচফ আরও অগ্রসর হলেন। বিশেষ গর্বিত হবার কিছু নেই। বর্ণালীতে হলুদ অংশে ফ্রায়ানহোফারের রেখার যেখানে অবস্থান, ঠিক সেখানেই সোডিয়াম বাষ্পে উজ্জ্বল হলুদ রেখাগুলো অবস্থান করছে। যা আমি এইমাত্র দেখলাম, নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি, একই রশ্মি বিকিরণকারী উদ্দীপ্ত বাষ্পের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় বিশোষিত হয়; সিদ্ধান্তটা স্বাভাবিক। আমি অনুমান করলাম, সোডিয়াম-মৌল সূর্যে রয়েছে কিন্তু আমরা এরও আগে যেতে পারি, রবার্ট। আমরা নিশ্চিতরূপে বলতে পারি, সৌর বর্ণালীতে হারিয়ে-যাওয়া বর্ণক্রমের প্রতিটি রাসায়নিক মৌলই সূর্যে উপস্থিত — অন্যভাবে বলা

যায় যে, সমস্ত বর্ণক্রম ফ্রায়ানহোফার রেখারা এসে দখল করেছে। বাস্তবিক-পক্ষে, কতকগুলি মৌলের অবস্থান আমার পরীক্ষায় ধরাও পড়েছে। কিন্তু ভালো হয়, এখন থেকে যদি এই আকর্ষণীয় অনুসন্ধান আমরা যৌথভাবে পরিচালনা করি। যাই বল না কেন, রবার্ট, আমি একজন পদার্থবিদ্ এবং রসায়নের অর্থাৎ তোমার বিভাগের বিজ্ঞান রহস্য অতি অল্প কিছুই আমার জানা। কিন্তু চিন্তা করো তো, বর্ণালী বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা সূর্যের অন্তঃপুরের রহস্য উদ্ঘাটনে চলেছি! তুমি কি কখনো চিন্তা করেছিলে, ন' কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরের আকাশের ঐ অগ্নিগোলকটি আমাদের এই গ্রহের সমস্ত রসায়ন মৌলের সমন্বয়ে সৃষ্ট? এমন কি সোনাও ওখানে আছে?

বুনসেন উত্তর দেবার আগে দরজায় করাঘাত শোনা গেল। কির্কচফের গবেষণাগারের ব্যবস্থাপক এসে দাঁড়িয়েছে। বাধা দিলাম বলে কিছু মনে করো না, বাইরে একজন যুবক অধ্যাপক বুনসেনের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

— এখন আমার সময় নেই, বুনসেন দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন। তাকে বল, রসায়ন শাস্ত্রের ভবিষ্যতে ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে এমন এক আলোচনার মধ্যভাগে এখন আমরা দাঁড়িয়ে।

ব্যবস্থাপক চলে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই দরজার ভেতরে উঁকি দিল। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু বাইরের যুবকটি খুবই উত্তেজিত, ভাঙা ভাঙা জার্মান ভাষায় তিনিও ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন।

— ঐ একই কথা বললেন?

— আপনার সঙ্গে তিনি যা আলোচনা করতে চাইছেন, রসায়ন শাস্ত্রের ভবিষ্যতে তা ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে দেখা দেবে।

এক মুহূর্তের জন্যে বুনসেন ও কির্কচফ নিঃশব্দে পরস্পরের প্রতি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, তারপর দু'জনেই হো হো করে হেসে উঠল।

— তুমি কি বলছ, গুস্টাভ? বুনসেন প্রশ্ন করল।— এই রসায়ন বিপ্লবীটি কে, একবার চেয়ে দেখবে না কি? অ্যান্টন, তাঁকে আসতে বল।

যুবকটি ঘরে ঢুকে মাথা হেঁট করে দুই বিজ্ঞানীকে অভিবাদন করলেন, তারপর নিজেকে পরিচিত করলেন ওঁর নাম দিমিত্রি আইভানোভিচ মেণ্ডেলিভ। তাঁর গায়ের রং ফ্যাকাসে, অপ্রশস্ত বক্ষ, বয়স পঁচিশ। তাঁর কালো কোটরগত চোখ দু'টি বিষণ্ণ, বাষ্পাচ্ছন্ন।

ওদের বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় বাধা সৃষ্টি করায় মেণ্ডেলিভ আবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তাঁর সময়েরও যথেষ্ট মূল্য। রাশিয়া উচ্চতর শিক্ষার্থে এক বছরের জন্য তাঁকে জার্মানি পাঠিয়েছে। এক মুহূর্তও অপচয় না করে তিনি ঐ সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য খুবই উদ্বিগ্ন। আগামী বছর, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে, রসায়নবিদ্‌দের নিয়ে কার্লস্রুয়ে এক আন্তর্জাতিক সভা বসবে। তাঁর আশা, ঐ আলোচনা-সভায় অংশ গ্রহণের জন্য বিখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ্ বুনসেনের শিক্ষণকেন্দ্রে তিনি প্রভূত শিক্ষা অর্জন করবেন।

— তুমি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবে? তা নাহলে কোন কাজ হবে না? বুনসেন ঠাট্টার ছলে জিগ্যেস করলেন। — আর তোমার উচ্চ-শিক্ষার জন্যে আমায় নির্বাচন করেছ? আমাকে এত সম্মান কেন?

— বুনসেন ও কির্কচফের নাম রাশিয়ায়ও সুপরিচিত। মেণ্ডেলিভ জানালেন।

— নিজেদের খুবই সম্মানিত মনে হচ্ছে। এখন বল তো, তুমি পদার্থবিদ্, না রসায়নবিদ্?

— রসায়নবিদ্।

— কোন্ বছরে?

রুশবাসীর উঁচু ক্ষীণ মুখমণ্ডলের ওপর একটা হাসির লহর দৌড়ে পালিয়ে গেল।

জার্মান প্রতিশব্দের জন্য কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি অধ্যাপক বুনসেনকে বোঝাতে চাইলেন যে এখনো ছাত্র থাকলে তিনি অধ্যাপককে বিরক্ত করতেন না।— আমি রসায়নের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেয়েছি এবং গত তিন বছর ধরে আমি সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্গানিক কেমিষ্ট্রি অধ্যাপনা করছি।— আর একবার অভিবাদন সহকারে তিনি বুনসেনের হাতে একটি বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্র তুলে দিলেন। আপেক্ষিক আয়তনের ওপর বোঝাতে বোঝাতে তিনি বললেন— দুর্ভাগ্যক্রমে এখনো ওর জার্মান ভাষায় অনুবাদ হয়ে ওঠে নি।

তা হলে তুমি আমার সহকর্মী বন্ধু— বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে বুনসেন বললেন। অথচ তুমি আমার অধীনে কাজ করতে চাও।

— আমার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত, রাশিয়ান বললেন। আমাকে

আমার গবেষণা চালানোর জন্যে আপনার কাছে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দিয়ে একটা গবেষণাগার পেতে অনুমতি দিন। নিজের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে গবেষণা চালানোর জন্য আমি তেমন অবসর পাই না।

এ তো অসম্ভব কথা বলছে— বুনসেন ভাবলেন। বালকের চেয়ে কিছু বড় এই নবযুবকটি আমার কাছে তা হলে এসেছে শিক্ষার জন্যে নয়, নিজেই সগর্বে ঘোষণা করছে, ওর নিজের গবেষণা চালানোর জন্য।

— আমি দুঃখিত— অধ্যাপক গম্ভীর ভাবে উত্তর করলেন— আমার মনে হয় না, তোমার জন্যে আমার শিক্ষণকেন্দ্রে কোন স্থান করা যাবে।

— আমি একটু বসতে পারি? রাশিয়ান হঠাৎ প্রশ্ন করলেন।

মেণ্ডেলিভ তারপর জার্মান বিজ্ঞানীদের জানালেন— তিনি অসুস্থ, যক্ষ্মারোগে ভুগছেন। ক্রিমিয়ায় এক বছর চিকিৎসার পর কিছুটা সেরেছেন বটে কিন্তু, নীরোগ হন নি। তারপর মেণ্ডেলিভ নিজের জীবনের কাহিনী শোনাতে লাগলেন।

— ভদ্রমহোদয়গণ, সমস্ত ব্যাপারটা আমার সহজসাধ্য ছিল না। আমি ছাড়া রসায়ন বিজ্ঞানে আর কেউই এত পথ পরিক্রমা করেন নি। সাইবেরিয়ার টাবলস্কে চতুর্দশ সন্তান হিসেবে আমার জন্ম। আমার বাবা ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি যখন দৃষ্টি হারালেন, শিক্ষকতা আর চালাতে পারলেন না, তখন আমার মা একটা কাচের কারখানা লিজ নিলেন, যাতে আমরা ষোলটি প্রাণী অন্তত খেতে পরতে পারি। কারখানাটি একদিন আগুনে পুড়ে গেল। বাবা মারা গেলেন। সাতান্ন বৎসর বয়স্কা মা আমাদের নিয়ে কয়েক হাজার মাইল দূরবর্তী মস্কোয় পাড়ি দেবার মনস্থ করলেন। ওটাই ছিল আমার রসায়ন বিজ্ঞানে যাবার পথ। সেন্ট পিটার্সবার্গে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের গণিত চিকিৎসা বিভাগে সরকার আমায় একটি বৃত্তি মঞ্জুর করলেন। একুশ বছর বয়সে স্বর্ণপদক লাভ করে বিশেষ পারদর্শীতার সঙ্গে আমি স্নাতক উপাধি পেলাম। ওডেসায় স্কুলের ব্যাকরণের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করতে যাব ঠিক করছি, এমন সময় আমার অসুখ খুব বেড়ে গেল।

যুবক পুরুষটি চোখ নামালেন। অস্বস্তিকর একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর বুনসেন সহানুভূতির সঙ্গে বললেন— প্রিয় সহকর্মী, আমি তোমার জন্য সত্যিই খুব দুঃখিত। দুঃখের মধ্যে দিয়ে

তোমার জীবন অতিবাহিত, কিন্তু তোমার বয়স কম, তুমি আবার সুখের মুখ দেখবে। ঠিক এই মুহূর্তে আমার শিক্ষণ-কেন্দ্রে তোমায় গ্রহণ করার কোন সম্ভাবনা দেখছি না। আমি ও আমাদের বন্ধু কির্কফ যে এক বিশিষ্ট অনুসন্ধান শুরু করতে যাচ্ছি, সে-কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। ও-সব কোন কাজেই আসবে না……

রাশিয়ান আবার ওপরে তাকালেন। তাঁর ব্যথাতুর, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো বুনসেনের ওপর নিবদ্ধ হলো। কিন্তু প্রিয় অধ্যাপক, আপনি কিন্তু এখনো জিগ্যেস করেন নি, হাইডেলবার্গে আমি কি ধরণের গবেষণা চালাতে চাই।

— কিছু মনে করো না। আমি তোমায় জানাচ্ছি, আমরা দু'জনে কিসের পেছনে চলেছি। আমরা কতকগুলো শূণ্যস্থান পূরণে ব্যস্ত—সৌর বর্ণালীর কয়েকটা ফাঁকা জায়গা।

— প্রায় ঐ একই পথে আমারও কিছু করার পরিকল্পনা—শ্রোতাদের বিস্মিত করে মেণ্ডেলিভ বললেন— প্রিয় অধ্যাপক বুনসেন, তাই মনে হচ্ছে, ভাগ্যই আমাকে তোমার কাছে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। আমি নিজেকে একটু ব্যাখ্যা করতে পারি ?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, করো।

— প্রথমেই বলে রাখি, আমি সবেমাত্র শুরু করেছি এবং বৈজ্ঞানিক-গতভাবে আমার ধ্যান-ধারণাগুলো যথাযথভাবে সূত্রবদ্ধ করার জন্যে হয়তো আরও অনেক সময় লাগবে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে, প্রকৃত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভাগ্য বর্ণনা বিশেষ গুরুতর অপরাধ। তাই ও-ক্ষেত্রে স্বচ্ছ-দৃষ্টির এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা আপনার কাছে অতিকথন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু অনুগ্রহ করে আমায় একটু সময় দিন। আপনাকে জানাই, আমি রসায়ন শাস্ত্রের এক পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্রতী হয়েছি। এই ব্যাপারে বিভিন্ন রাসায়নিক মৌলগুলোকে একটা প্রণালীর মধ্যে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যেহেতু সাধারণ মৌলের রাসায়নিক ধর্মের সঙ্গে ওদের আণবিক ভরের একটা সম্পর্ক আছে, আমার মনে হয়, ওদের আণবিক ভর অনুসারে বিন্যস্ত করা যায়। আমি প্রত্যেক মৌলের জন্য ছোট ছোট কার্ড লিখে ফেললাম, সেই সঙ্গে যার যা আণবিক ভর ও প্রধান প্রধান ধর্ম। তারপর কার্ডগুলো এমনভাবে সাজালাম, যাতে প্রায় সমগোত্রীয় রাসায়নিক ধর্মের ও প্রায় কাছাকাছি

আণবিক ভরের মৌলগুলো পর পর থাকে। এতে প্রচুর পরিশ্রম ও বাছা-বাছি করতে হলো—যেন একটা খেলা! কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, বিভিন্ন মৌলের রাসায়নিক ধর্ম ও আণবিক ভরের মধ্যে একটা পর্যায় -- সম্পর্ক প্রকাশ করা গেছে।

বুনসেন স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন। তিনি এবার রাশিয়ানকে বাধা দিলেন। — তুমি এখন তোমার মৌলের ঐ ব্যবস্থা প্রণালী আমার শিক্ষণ-কেন্দ্রে বসে বিকাশ করে তুলতে চাও?

— ব্যবস্থা প্রণালীটি নয়। রাশিয়ান বিনীতভাবে বললেন। প্রিয় অধ্যাপক, আমার কাছে যা এখনো স্পষ্ট নয়, তা আমি আপনার কাছে শিখে নিতে চাই। তারপরই দেখতে চাই, মৌলগুলোর এলোপাথাড়ি ভিড়ের মধ্যে কোন সুসংবদ্ধ নিয়ম প্রণয়ন করা যায় কি না। যাই বলুন, জার্মান বিজ্ঞানীরা— হাসিমুখে তিনি বলতে লাগলেন— সারা দুনিয়ায় সুশৃঙ্খল রূপে পরিচিত আর তার জন্য হয়তো একটু সিদ্ধান্তবাদী। আপনি নিশ্চয়ই আমার চেষ্টার তারিফ করবেন…।

হাইডেলবার্গের দুই বিজ্ঞানীরও মুখে হাসি। হঠাৎ তাঁদের মনে হলো ঐ সঙ্কীর্ণ বক্ষ রাশিয়ান মানুষটি তাঁদের সুদীর্ঘকালের পরিচিত।

— আমার সঙ্গে এ-বছর তুমি কাজ করবে— বুনসেন মেণ্ডেলিভকে আশ্বস্ত করতে চাইলেন। তুমি আমার কাছে এসেছ দেখে আমি খুব আনন্দিত, মেণ্ডেলিভ। কিন্তু তোমার আর একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া বাকি। কিছুক্ষণ আগে আমরা যখন বলছিলাম, আমরা সৌর বর্ণালীতে কতগুলো শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা করছি, তখন তুমি বললে না, তোমার মনের মধ্যে ঐ একই ধরণের কি ঘোরাফেরা করছে, সংক্ষেপে বল তো, তুমি কি বলতে চাও?

— ওটা অন্য ব্যাপার, আমি প্রমাণ করে দেখাতে পারব না— সম্ভবত বহু বছর ধরেই প্রমাণ করতে পারব না!—রাশিয়ান উত্তর করলেন, ব্যাপারটা এই। আমার ব্যবস্থাপ্রণালী অনুযায়ী মৌলগুলোকে সাজাতে গিয়ে বার বার দেখা গেল, রহস্যজনক সব ফাঁক রয়ে গেছে। অন্য ভাবে বলতে হয়, কোন কোন মৌলের মধ্যে স্থানের সংস্থান করে রাখা ভালো, সেই সব মৌলের জন্য স্থান যা, এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু আমার অনুমান সত্য হলে ওরা নিশ্চয়ই আছে।

— ঐ স্থানগুলো পূরণ করতে হলে নতুন নতুন মৌল আবিষ্কার করতে হবে।

— তুমি আমায় একটা উদাহরণ দিতে পার? বুনসেন জিগ্যেস করলেন।

মেণ্ডেলিভ এক মিনিট ভাবলেন। তারপর তিনি একটা কাগজ চাইলেন। পকেট থেকে একটা পেন্সিল বার করে লম্বালম্বি ও আড়াআড়িভাবে কতক-গুলো সরলরেখা টেনে ওদের বর্গগুলোর মধ্যে রাসায়নিক সঙ্কেত লিখতে লাগলেন।

— এই হচ্ছে একটা উদাহরণ। তিনি ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন।

— আমি, ক্যালসিয়ামকে নিয়ে শুরু করছি, কারণ আমি জানি, ক্যালসিয়াম মৌল পর্যবেক্ষণ আপনার খুব প্রিয়। আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন, আমি আড়াআড়িভাবে কতকগুলো মৌল এমনভাবে সাজিয়েছি, যাতে তাদের আণবিক ভরগুলো বাম থেকে ডাইনে ক্রমশ বেড়ে গেছে। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, ওদের রাসায়নিক ধর্ম অনুসারে ওদের মধ্যে একটি পর্যায়ের ধাঁচ গড়ে উঠেছে। কারণ লম্বালম্বি প্রত্যেক স্তম্ভে সেই সব মৌলগুলো স্থান পেয়েছে, যাদের রাসায়নিক ধর্মের মধ্যে একাত্মতা আছে। সোডিয়ামের নিচে পটাসিয়াম স্থান পেয়েছে, কারণ ওর সঙ্গে সোডিয়ামের সাদৃশ্য আছে। অনুরূপভাবে ক্যালসিয়াম আছে ম্যাগনেসিয়ামের নিচে। এখন আণবিক ভর অনুসারে পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়ামের পরবর্তী মৌল হবে টিটানিয়াম, যার আণবিক ভর ৪৮। এর আণবিক ভর অনুসারে সারণীতে এর যথাযথ স্থান হবে ক্যালসিয়ামের পরে এবং অ্যালুমিনিয়ামের নিচে। কিন্তু রসায়নবিদ্ হিসেবে আমার বিবেক তা মানতে চায় না, কারণ রাসায়নিক-গুণের দিক থেকে টিটানিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি কি বোঝাতে চাইছি, বুঝতে পারছেন? টিটানিয়ামের

11 NA 23·0 সোডিয়াম	12 MG 24·3 ম্যাগনেসিয়াম	13 AL 27·0 অ্যালুমিনিয়াম	14 Si 28 সিলিকন
19 k 39·1 পটাসিয়াম	20 Ca 40·1 ক্যালসিয়াম	?	22 Ti 47·9 টিটানিয়াম

রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে আমি স্থির করেছি— যদিও বোঝার সুবিধার জন্য— ওকে ডান দিকে আর এক ঘর সরাতে, যাতে ও এখন রয়েছে

২৮ আণবিক ভরের সিলিকনের নিচে। এর ফলে ফাঁকা ঘর সৃষ্টি হলো ক্যালসিয়াম আর টিটানিয়ামের মধ্যে। এই রকম······

বুনসেন গভীর আগ্রহ সহকারে রাশিয়ান বিজ্ঞানীর ব্যাখ্যা শুনছিলেন। এবার তিনি চিত্র থেকে মুখ তুলে চাইলেন— মেণ্ডেলিভ, তোমার ধারণা, ক্যালসিয়াম টিটানিয়ামের মধ্যকার শূন্য ঘরটি এ-যাবৎ অনাবিষ্কৃত কোন মৌলের।

— তাইতো আমার অনুমান। ওটা অ্যালুমিনিয়ামের রাসায়নিক ধর্মের সমতুল্য ধর্মের কোন মৌল হবে, যার আণবিক ভর ৪০ ও ৪৮-এর মধ্যে।

— কিন্তু তোমার ঐ শূন্যঘর পূরণের জন্য তুমি কিভাবে এই অজানা মৌলটি আবিষ্কার করতে চাও?

— তা আমার এখনো জানা নেই। রাশিয়ান বিজ্ঞানী স্বীকার করলেন।

— কিন্তু অধ্যাপক বুনসেন, আমি সম্ভবত আপনার গবেষণাগারে শিক্ষা করতে পারব, অজানা মৌল আবিষ্কার করতে কিভাবে যাত্রা করতে হয়?

পরিহাসছলে কথাটা উচ্চারিত হলেও পদার্থবিদ্ কির্কচফ ঐ কথার সঙ্কেত ধরেই রাশিয়ান আসার পর এই প্রথম মুখ খুললেন।

— সত্যিই কোন সৌভাগ্যক্রমে আজকের দিনে আপনি এখানে উপস্থিত। আমার যদি কোন মারাত্মক ভুল না হয়ে থাকে, আমরা সবেমাত্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাসায়নিক মৌলের অবস্থান আবিষ্কারের জন্য একটা ব্যবহারযোগ্য উপায় 'বর্ণালী বিশ্লেষণ' উদ্ভাবন করেছি।

রাশিয়ান সচকিত হয়ে উঠলেন। এমন কি যে সব মৌল এখনো আমাদের অজানা!

— খুব সম্ভবত।

এক বছর পরে রাশিয়ায় ফিরে যাবার ঠিক আগে মেণ্ডেলিভ কার্লশ্রুয়ের এক বিরাট সভাকক্ষে বসে বিভিন্ন ভাষায় সহগামী বিজ্ঞানীদের তর্ক-বিতর্ক কান পেতে শুনছিলেন। সারা বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রসায়নবিদেরা বাডেন শহরের রাজধানীতে জড়ো হয়ে রসায়ন-শাস্ত্রের সর্বকালের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী— যেমন আণবিক ভর, পরমাণবিক ভর, যোজ্যতা এবং রহস্যপূর্ণ শক্তি যা মৌলের পরমাণুগুলোকে সুশৃঙ্খলভাবে বেঁধে রেখেছে— প্রচুর ধ্যান-ধারণা নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলেন।

মেণ্ডেলিভ একজন জার্মান রসায়নবিদের পাশে বসে ছিলেন। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করেছিলেন। তাঁর প্রতিবেশী হলেন তাঁর চেয়ে কয়েক বছরের বড় লোথার মেয়ের। উনি আগে একজন চিকিৎসাবিদ্ ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে ব্রেস্লো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ ও রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক।

এ পর্যন্ত জার্মান ও রাশিয়ান দুই বিজ্ঞানীর মধ্যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কোন আলোচনার সুযোগ ঘটে নি। কিন্তু এখন তাঁরা জন নিউল্যাণ্ড্স্ নামক এক ব্রিটিশ বিজ্ঞানীর বক্তৃতা শুনছিলেন।

— যদি রাসায়নিক মৌলগুলোকে— বক্তা বোঝাচ্ছিলেন— তাদের তুলাঙ্ক ভর (অর্থাৎ ১·০০৮ গ্রাম হাইড্রোজেনের সঙ্গে যে পরিমাণ কোন মৌলের ওজনের মিশ্রণ ঘটে) অনুসারে আড়াআড়ি পঙ্‌ক্তিতে সাজানো হয়, তা হলে আমরা দেখতে পাই, একই শ্রেণীভুক্ত মৌলগুলো নির্দিষ্ট নিয়মে একই খাড়া পঙ্‌ক্তিতে আবির্ভূত হচ্ছে। এর অর্থ, সমগোত্রীয় মৌলের পরমাণুগত সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য সাত বা সাতের গুণিতক। অতএব এই ধরনের মৌলের পরমাণুগত সম্বন্ধ সঙ্গীতের সপ্তমের সম্বন্ধের অনুরূপ। নাইট্রোজেন তালিকায়, যেমন ফসফরাস ও আর্সেনিকের মধ্যে ১৪টি মৌল আছে, আরো ১৪টি আছে অ্যান্টিমণি ও বিসমাথের মধ্যে। যদি ওদের পারমাণবিক ভর অনুসারে ছোট থেকে বড়, এইভাবে সাজানো হয়, প্রতিটি মৌল সাত ঘর পরে পরে আসে, যা দেখে আমরা বুঝতে পারি, ওদের ঠিক ওপর সারির সঙ্গে একটা রাসায়নিক ধর্মগত সাদৃশ্য আছে। মৌলগুলোর এই অদ্ভুত সম্বন্ধকে, আমি প্রস্তাব করছি, 'বিধি সপ্তক' নাম দেওয়া হোক।

— ওটা আপনার অন্যায় চাহিদা! দাড়িওয়ালা এক অধ্যাপক ক্রুদ্ধস্বরে বক্তাকে বাধা দিলেন। এর পরই আপনি যে রাসায়নিক মৌলগুলোকে ইংরাজি বর্ণমালা অনুসারে নামকরণ করতে চাইবেন— লিথিয়ামের জন্যে A, সোডিয়ামের জন্যে B, পটাসিয়ামের জন্যে C— এতে আর সন্দেহ কি! বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিদ্রূপাত্মক হাসি ও উত্তেজনামূলক বিতর্কের ঝড় উঠল।

কেবল জার্মান বিজ্ঞানী লোথার মেয়ের এবং রাশিয়ান বিজ্ঞানী দিমিত্রি আইভানোভিচ মেণ্ডেলিভ, যাঁরা দৈবক্রমে পাশাপাশি বসেছিলেন, তাঁরাই ঐ বিতর্কের ঝড়ে অংশ গ্রহণ করলেন না। পরস্পরের বিষয় সম্বন্ধে পরিচিত না হয়েও, তাঁরা উভয়েই একই কথা ভাবছিলেন, সিদ্ধান্তের দিক থেকে

ইংরেজ বিজ্ঞানীই ঠিক ; উনি ঠিক রাস্তায়ই চলেছেন, যদিও তিনি ঠিক দেখতে পাননি যে তাঁর বিধি প্রথম দুই সারির মৌলগুলোর বেলায়ই কেবল প্রযোজ্য। পরে ভিন্নতর এক নিয়ম প্রবর্তিত হলো, তবুও নিয়ম তো······

সৌভাগ্যক্রমে মেয়ের ও মেণ্ডেলিভ যদি আলোচনায়-অংশ গ্রহণ করতেন, তা হলে তাঁরা পরের বছরগুলির এক দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক তর্কবিতর্ক থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারতেন : রাসায়নিক মৌলের ধর্ম যে তাদের আণবিক ভরের দ্বারা পর্যায় ধাঁচে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাঁরা এই মূলবিধিকে প্রথম সূত্রাকারে তুলে ধরেন। একা একা প্রভূত পরিশ্রম সহকারে রসায়নশাস্ত্রের অজ্ঞাত ক্ষেত্রে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে তাঁরা হয়তো যৌথভাবে পরস্পরের 'সহযোগিতায়' মৌলের পর্যায় ব্যবস্থার ওপর কাজ করতেন।

বাস্তবিকপক্ষে তাঁরা সভার শেষে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একজন ব্রেস্লো ও অপরজন রাশিয়ার পথে যাত্রা করলেন। তাঁদের আর সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু এককভাবে পৃথিবীকে রাসায়নিক মৌলের পর্যায় সারণী উপহার দেওয়ায় তাঁরা দু'জনেই বিজ্ঞানের স্মরণীয়।

বুনসেনও কার্লস্রুয়ের মহারসায়ন সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। হাইডেলবার্গে ফিরে তিনি কির্কচফের সঙ্গে বর্ণালী বিশ্লেষণের বহুমূল্য উপযোগিতার অনেক প্রমাণ আবিষ্কার করতে লাগলেন। এমন কি জটিল পদার্থে অবস্থিত এক মিলিগ্রামের হাজার ভাগের এক ভাগের মত মৌলের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ যা রাসায়নিক বিশ্লেষণে ধরা পড়ত না, তাও বর্ণালীদর্শীর সাহায্যে সনাক্ত করা সম্ভব হয়ে উঠলো!

সূর্যের এই সংক্ষিপ্ত অথচ শিক্ষাপ্রদ অধ্যয়নের পর ঐ দুই বিজ্ঞানী পৃথিবীকে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন। অগ্নিশিখার বর্ণালীর সাহায্যে তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে, এ পর্যন্ত বিরল হিসেবে কথিত কোন কোন মৌল বস্তুতপক্ষে প্রায়ই দেখা যায়। এত দিন ইহা দুর্লভ মনে হতো, তার কারণ, রসায়নশাস্ত্রের প্রচলিত বিধি অনুসারে তাদের একে অন্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে ধরা যেত না। বিশেষ করে ঐ দুর্লভ মৌলের সন্ধানে তাঁরা এবার বর্ণালী বিশ্লেষণকে কাজে লাগাতে লাগলেন। জানা ও পরিচিত মৌলগুলোকে তাদের বিশিষ্ট বর্ণরেখার দ্বারা চিহ্নিত করার পর, বুনসেন ও কির্কচফ নিশ্চিত : জটিল বর্ণালীতে শীঘ্রই নতুন বর্ণরেখার উপস্থিতি লক্ষ্য করবেন।

কিন্তু এপর্যন্ত তা ঘটে ওঠে নি।

একদিন দুই বন্ধু বাভেরিয়ার খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চলের ডর্কহাইমের আর্সেনিক মিশ্রিত উষ্ণ প্রস্রবণের জল নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। বুনসেন-বার্ণারে তাঁরা ঐ খনিজ পদার্থ মিশ্রিত জল বাষ্পীভূত করলেন এবং প্রত্যহ যা করেন, ঐ উদ্দীপ্ত গ্যাস বর্ণালীদর্শী দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন।

বুনসেন হঠাৎ গাষ্টভের উদ্দেশ্যে বললেন— কী অদ্ভুত নীল বর্ণ!

কির্কচফ যন্ত্রে চোখ রাখলেন। উদ্দীপ্ত বাষ্পে তাঁরা এক জোড়া নীল রেখা দেখলেন। পূর্বে তো এমনটি দেখা যায় নি, এর অর্থ কি?

— গাষ্টভ, এর অর্থ আমরা নতুন এক মৌল আবিষ্কার করলাম— বর্ণালী বিশ্লেষণে আবিষ্কৃত প্রথম মৌল। এতে কোন সন্দেহ নেই। যদিও এর একটা রেখা বিশিষ্ট নীল ষ্ট্রংশিয়ামের 'ব' রেখার স্থানেই অবস্থান করছে, তবুও দুটোকে এক ভেবে গুলিয়ে ফেলার কোন কারণ নেই। আমাদের জানা কোন পদার্থই এমন উজ্জ্বল দু'টি নীল রেখা দেখায় না। অতএব এটা যে একটা নতুন মৌল— এই আমার স্থির সিদ্ধান্ত। সম্ভবত এটা ক্ষার ধাতুর অন্তর্গত। এর অর্থ দাঁড়ায় লিথিয়াম, সোডিয়াম এবং পটাসিয়াম ছাড়াও এই দলে চতুর্থ, এমন কি সম্ভবত পঞ্চম কোন মৌল আছে।

— এটা একটা বিস্ময়কর সংবাদ, কির্কচফ জানালেন। বড় আফশোস হচ্ছে, এই মুহূর্তে স্ত্রী ঘরের বাইরে গেছেন আর তুমিও অবিবাহিতা। স্ত্রী ঘরে থাকলে সে-ই এই নব জাতকের জননী হতে পারত। আমরা এর কি নাম রাখব!

বুনসেন এক মুহূর্ত কি ভাবলেন। তারপর বললেন, এস, আমরা এর নাম দিই সীসিয়ম। লাটিন ভাষায় 'সীসিয়স' অর্থ নীল। কিন্তু অত তাড়াহুড়ো করে বোতল খুলতে যেও না। শিশুকে আগে শুকিয়ে পরিষ্কার কর।

— রবার্ট, তোমার মতলব কি?

ডর্কহাইমের খনিজ জলের প্রস্রবণ থেকে অন্যান্য খনিজ পদার্থকে সীসিয়ম থেকে পৃথক করে শুদ্ধ আকারে প্রস্তুত করাই আমার পরবর্তী কাজ। সর্বপ্রথম আমি পটাসিয়ামের দ্রাবণ তৈরি করব। কারণ সীসিয়ম পটাসিয়ামের সঙ্গে থিতিয়ে যায়। তাই এযাবৎ পৃথক করে নতুন মৌল হিসেবে সনাক্ত করাও যায় নি।

বুনসেন কিন্তু তখনো ভাবতে পারেন নি যে, কি পরিশ্রমের কাজ তিনি

হাতে নিলেন। প্রায় ৪৪,০০০ লিটার ডর্কহাইমের জল থেকে জটিল রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় ৭·২৭ গ্রাম সীসিয়ম পাওয়া যায়। যাই হোক, পরীক্ষাটা সফল হলো। ছোট একটা পরীক্ষা নলে অন্যান্য মিশ্রণ থেকে পৃথক অবস্থায় বুনসেন সীসিয়ম পেলেন। এখন তার বর্ণালীদর্শীতে নীল বর্ণ নয়, সীসিয়ম রজতশুভ্র ধাতুর আকারে মিলল।

এক বছর পর বুনসেন ও কির্কচফ দ্বিতীয় মৌলটি আবিষ্কার করলেন। এবার বর্ণালীর লাল সারির শেষে দেখা গেল এক জোড়া লাল রেখা। তাঁরা এর নাম রাখলেন রুবিডিয়াম। লাটিন ভাষায় রুবিডাস শব্দের অর্থ— গাঢ় লাল। এইভাবে ক্ষার ধাতুর পঞ্চম মৌল— রুবিডিয়াম আবিষ্কৃত হলো।

অজ্ঞাত মৌল-আবিষ্কারের ক্ষেত্রে হাইডেলবার্গ বিজ্ঞানীদ্বয়ের এই অভিনব পদ্ধতির আলোড়নকারী সাফল্য বিজ্ঞানজগৎকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিল। রসায়নবিদেরা উঠে-পড়ে লাগলেন নতুন নতুন মৌল আবিষ্কারের কাজে। বুনসেনের রুবিডিয়াম আবিষ্কারের কয়েক মাসের মধ্যে স্যর উইলিয়ম ক্রুক্স গন্ধক কারখানার অবশিষ্টাংশের ওপর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে আবিষ্কার করলেন থালিয়াম। বর্ণালী-বিশ্লেষণে থালিয়াম দিল উজ্জ্বল সবুজ রেখা। থালিয়ামের পরে আবিষ্কৃত হলো ইণ্ডিয়াম।

ক্যালসিয়াম ও টিটেনিয়ামের মধ্যবর্তী ঘর তখনো ফাঁকা। কে ওটা ভরবে? কে প্রমাণ করবে যে মেণ্ডেলিভ মুখেই বড় বড় কথা বলতেন না, প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন।

ইতিমধ্যে মেণ্ডেলিভ রাশিয়ায় তাঁর মৌলের পর্যায় প্রণালী মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করেছেন। লোথার মেয়েরও স্বতন্ত্রভাবে পর্যায় ধাঁচে রাসায়নিক মৌলগুলি সাজান। ঐ বছরই তিনি জার্মানিতে তাঁর পদ্ধতিটি ঘোষণা করেন।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন বিজ্ঞানী সূর্যের রহস্য উদ্‌ঘাটনের আর এক পথে যাত্রা শুরু করেন। এবার আর হাইডেলবার্গে নয়, ভারতবর্ষে। অদৃষ্টপূর্ব সূর্যগ্রহণের বছর। উত্তর আটলান্টিক থেকে এশিয়ার মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে চাঁদ সূর্যকে কিছুক্ষণের জন্য আড়াল করছিল। বর্ণালীদর্শীর সাহায্যে বুনসেন ও কির্কচফ মহাকাশের কোন বাসিন্দাকে রাসায়নিক বিশ্লেষণে আনার পর এটাই ছিল প্রথম সূর্যগ্রহণ। অতএব এমন সুযোগকে হাতছাড়া করে? কারণ শুধু সূর্যগোলক নিরীক্ষণ নয়— ফ্রয়ানহোফার যা ব্রিজমের

সাহায্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এবার সূর্যের পরিমণ্ডলেও তা নিরীক্ষণ করা যাবে, যার ক্ষীণ আলো সূর্যের অতো উজ্জ্বলতায় সচরাচর দেখা যায় না। চাঁদের গোলকে সূর্য যখন একেবারে ঢাকা পড়ে যায়, কেবল তখনই চাঁদের কালো বৃত্তের চারিপাশে রুপোর মালার মত ওকে দেখা যায়। দেখায় যেন লক্ষ লক্ষ ডিগ্রি তাপমাত্রার উদ্দীপ্ত গ্যাসের সমুদ্র। একই সঙ্গে সূর্যের উপরিভাগ থেকে উত্থিত লাল রঙের শিখাও দেখা যায়। প্রবর্ধ নামক এই শিখাও সচরাচর দেখা যায় না।

মাত্র কয়েক মিনিট সূর্যের এই পরিমণ্ডল পর্যবেক্ষণের জন্য প্যারিস অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স কর্তৃক সংগঠিত এক দল অভিযাত্রী জ্যোতির্বিদ্ পি. জে. সি জানসেনের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের পথে দীর্ঘ অভিযান শুরু করলেন। জোসেফ নর্মান লকার নামক এক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী— স্যর নর্মান লকার নামে যিনি এখন স্মরণীয়— ঐ অভিযাত্রীদলে যোগদান করলেন।

কয়েক দিন কঠিন পরিশ্রমের পর বিজ্ঞানীরা তাঁদের স্থান ঠিক করে নিলেন, পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বসালেন। গভীর উত্তেজনায় ভর করে তাঁরা সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখার জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তাঁদের বড় আশা — এই দৃশ্য নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত ঐ বিরাট অগ্নিগোলক সম্বন্ধে নতুন রহস্য উদ্‌ঘাটিত করবে। তাঁরা এমন স্থান বেছে নিলেন, যেখান থেকে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। চাঁদের কালোমণ্ডল ইতিমধ্যেই ধীরে ধীরে সূর্যের উজ্জ্বল অগ্নিগোলকের ওপর উঠে আসছে। চাঁদের আড়ালে ক্রমশই সূর্য হারিয়ে যেতে লাগল। পাণ্ডুর গোধূলির আলোয় দিগ্‌ দিগন্ত ভরে উঠল।

আশপাশের পরিবেশের দিকে যদি একটু তাকিয়ে দেখার সময় পেতেন, তা হলে বিজ্ঞানীরা দেখতে পেতেন, গাছে গাছে দিনের বেলার ফুলগুলো পাঁপড়ি মুড়ছে আর রাতের ফুল দল মেলে চাইছে। সূর্যের রশ্মির একটা বৃত্তক কেবল জেগে রইল লাল আর নীল রঙের লেলিহান জিহ্বা মেলে। মনে হতে লাগল, চাঁদের কৃষ্ণাভ থালাটির পরিধি জুড়ে আগুন ধরে গেছে। আকাশে তারা দেখা দিল। বাতাসে হঠাৎ একটা হিমশীতল স্পর্শ অনুভূত হলো। সমস্ত স্থলভাগের ওপর দিয়ে দমকা হাওয়া ছুটে গেল। পাখিরা ঘুমিয়ে পড়ল। অরণ্যে হিংস্র জন্তুর গর্জন শোনা গেল।

কিন্তু পর্যবেক্ষণ যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত বিজ্ঞানীদের ওদিকে চোখ-কান দেবার

অবসর কোথায়? গভীর আগ্রহে ওরা মহাকাশের প্রেক্ষাপটে নাটক দেখতে তন্ময়— সূর্য ও চন্দ্রের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। হঠাৎ জানসেন চিৎকার করে উঠলেন— অধ্যাপক লকার, আমি কিছু কল্পনা করছি না। আপনিও কি বর্ণালীতে এক উজ্জ্বল হলুদ রঙের বিচ্ছুরণ দেখছেন না?

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে কাটল। তারপর লকার বললেন— জানসেন, আমার চোখকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু তোমার চোখেও যখন একই জিনিস ধরা পড়েছে তখন আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? সূর্যের বর্ণালীতে এক স্বচ্ছ হলুদ রেখা। এর অর্থ কি? পরে, পরে…ফরাসী ভদ্রলোক অস্ফুট স্বরে বললেন— আমরা এখন পর্যবেক্ষণ করে যাব।…

অনেকক্ষণ হলো দিনের আলো আবার ফিরে এসেছে। বিজ্ঞানীদের মাথার ওপর ভূমধ্যরেখার সূর্য প্রখর ভাবে কিরণ দিচ্ছে। তবু তাঁদের ভ্রূক্ষেপ নেই, কথার শেষ নেই। তাঁদের বিস্ময়কর আবিষ্কারকে ঘিরে তখনো তাঁদের আলোচনা আবর্তিত হচ্ছে। ফ্রয়ানহোফার রেখা ছাড়াও সূর্যের বর্ণালীতে একটা উজ্জ্বল হলুদ রেখা আছে। রেখাটির অস্তিত্ব এমন জায়গায়, যেখানে এ পর্যন্ত জানা আমাদের পৃথিবীর কোন মৌল কোন বর্ণরেখা প্রদর্শন করে নি।

লকারই ওদের সংশয়ের নিরসন করে বলল – পৃথিবীতে নয়, সূর্যে আমরা যে একটা নতুন মৌল আবিষ্কার করেছি, এ অনুমান করা ছাড়া উপায় নেই। বিশিষ্ট হলুদ বর্ণের এক মৌল। পৃথিবীতে এ রকম কোন মৌল মেলে নি। সূর্যে এর অবস্থান বলে একে বলা যাক হীলিয়াম।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার বিজ্ঞানী নীলসন ক্যালসিয়াম ও টিটানিয়ামের মধ্যবর্তী মেণ্ডেলিভের ফাঁকা ঘরটি পূরণ করতে সক্ষম হলেন। তাঁর দেশের নামানুসারে এই মৌলের নাম হলো স্ক্যাণ্ডিয়াম। এর পারমাণবিক ভর ৪৫। বহু বছর আগে রেখে যাওয়া মেণ্ডেলিভের পর্যায় সারণীর একটি ঘর এইভাবে এক নতুন মৌল এসে ভরে দিল। এরও সাতবছর পরে জার্মান রসায়নবিদ্ ক্লেমেন্স্ উইংকলার জার্মেনিয়াম মৌলটি আবিষ্কার করে মেণ্ডেলিভ ও তাঁর প্রণালীর বিজয় সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

প্রতিকারক ও সংহারক রশ্মি

শিক্ষার সময় দ্রুত শেষ হয়ে আসছে, উট্রেক্ট ব্যাকরণ স্কুলের নিম্ন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রদের মনে তাই আনন্দ আর ধরে না। ওদের মধ্যেই একজন ইতিমধ্যে ব্ল্যাকবোর্ডে ওদের খুব অপ্রিয় গণিত শিক্ষকের একটা বিদ্‌ঘুটে কার্টুন এঁকে রেখেছে। অন্যান্য ছাত্ররা হৈ চৈ করতে করতে গিয়ে ঐ ব্ল্যাক-বোর্ডের চারপাশে ভিড় করেছে।

যুবক পিয়েটর ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল চিত্রকর, কিন্তু অপর দিকে গণিতে ওদের শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ। অতএব ওর আঁকা ছবিতে যে গণিত শিক্ষকের কোন তোষামোদি থাকবে না, এতে আর আশ্চর্য কি! ওর পাশেই দাঁড়িয়েছিল লম্বা পাতলা গড়নের উইলহেল্ম রয়েণ্টজেন। রয়েণ্টজেন অঙ্কে অপেক্ষাকৃত ভালো, কিন্তু পিয়েটরের মত গণিত শিক্ষক তারও মনঃপূত নয়। ওদের শ্রেণীতে রয়েণ্টজেন কিন্তু এখনো 'নবাগত'; রিনেল্যাণ্ড থেকে সে সবে হল্যাণ্ডে এসেছে। তার বাবা-মা থাকতেন জার্মানিতে। তাঁরা ওকে উট্রেক্টে তাঁদের আত্মীয়দের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কারণ তাঁদের আশা : ছেলে বিদেশে থাকলে পৃথিবী সম্বন্ধে কিছু জানতে পারবে। তারপর আরও অভিজ্ঞতা নিয়ে সে বাবার ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করবে এবং একদিন ছোট্ট লেনেপ শহরে তার বাবার কাপড়ের কলের মালিক হয়ে বসবে।

ব্ল্যাকবোর্ডের চিত্রকর তার আঁকা শেষ করে কয়েক পা পিছিয়ে এল আঁকাটা ভালো করে পরখ করার জন্যে। দর্শকদের, বিশেষ করে ঐ নতুন ছেলেটির প্রশংসায় সে খুব খুশি। এই ষোল-সতের বছর বয়স্ক ছেলেরা নিজেদের এই মজার খেলায় এতই মশগুল যে, তাদের ঐ হাসি ঠাট্টার মাঝখানে কখন যে গণিতের শিক্ষক এসে ঢুকেছেন ওরা টের পায় নি।

— রয়েণ্টজেন, এই অসম্মানকর অঙ্কনটা কি তোমার? উপহাসাস্পদ

শিক্ষক প্রশ্ন করলেন। অন্যান্য ছেলেরা ইতিমধ্যে যে যার ডেস্কে ফিরে গেছে, কেবল রয়েন্টজেনই ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সুতরাং সে-ই দোষী সাব্যস্ত হলো।

— না, স্যর, আমি মোটেই আঁকতে পারি না। ছেলেটি উত্তর করল। খাঁটি সত্যি কথা। শিক্ষক মহাশয় নিজেও ঐ ধরনের উক্তিই শুনেছিলেন সহকর্মী ড্রয়িং-শিক্ষকের মুখে কমনরুমে বসে।

— তাহলে কে দায়ী, তুমি বলো।

রয়েন্টজেনের দৃষ্টি সমস্ত ক্লাসে একবার ঘুরে এল। কিশোর মাথাগুলা তখন পুস্তকে কাগজে ঝুঁকে পড়েছে। উইলহেল্ম যদিও তখনো তার সহপাঠীদের মধ্যে নিজেকে বিদেশী বলে মনে করছে, তবুও তাদের একজনকে শিক্ষকের সামনে হেয় করার কথা সে ভাবতেই পারছে না।

গণিতের শিক্ষক কয়েক মিনিট চুপ করে থাকলেন। তুমি যখন কথা বলছো না, এর পরিণাম কিন্তু তোমাকেই বহন করতে হবে। তিনি জানালেন। — যতক্ষণ না প্রকৃত দোষীর সন্ধান পাচ্ছি, আমি তোমাকেই এই অসম্মানজনক চিত্রের জন্য দায়ী করব।

রয়েন্টজেনের দৃষ্টি সাহায্যের প্রার্থনা করে আবার সারা কক্ষে ঘুরল। কিন্তু কোন সহপাঠীই সাহায্যের হাত বাড়াল না। কেউই আর দু'মাসের জন্য স্কুলের রেকর্ড খারাপ করতে চাইল না।

— বেশ, এবার আমাদের পড়ার কাজ শুরু করা যাক। আর রয়েন্টজেন, তোমার সঙ্গে আমার পরে কথা হবে।

কয়েক দিনের মাথায় বিপর্যয় ঘটল। ঘটনাটা রয়েন্টজেন যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। স্রেফ একটা ছেলেমানুষীর জন্যে— যে ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। অথচ তার বাবা ভাবতেন, ছেলে নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যাবে। কিন্তু দেখা গেল, এই ব্যাকরণ স্কুল থেকে ছাড়পত্র না পেলে তা অসম্ভব। বহিরাগত ছাত্র হিসেবেও যদি স্কুলের শেষ পরীক্ষার অনুমতি সে না পায়, বাবার কাছে গিয়ে কারবারে যোগদান করা ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। অথচ মন থেকে ওটার দিকে তার বিন্দুমাত্র সায় ছিল না। বয়সে সে তখনো যুবক এবং জীবন সম্বন্ধে তার কোন উদ্বেগ ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন

কিছু ভাবার অবকাশও তার হয় নি। শুধু এইটুকু সে মনে-প্রাণে জানত— বাবার ব্যবসার গণন কক্ষে তার জন্যে কোন স্থান নেই। তবে কোথায় তার স্থান?

উদ্বেগ দুশ্চিন্তায় একটা বছর পার হলো। অবশেষে পিতা-পুত্রের যৌথ আবেদনে উট্রেক্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক উইলহেল্মকে বহিরাগত ছাত্র হিসেবে স্কুল-ত্যাগের শেষ পরীক্ষায় বসতে দিতে রাজি হয়ে গেলেন। এইভাবে আঠার বছরে ছেলে পরীক্ষকদের সম্মুখীন হলো। প্রথম প্রথম বেশ ভালই হলো। প্রধান প্রধান সব বিষয়ই সে উৎরে গেল— কিন্তু গণিতের পরীক্ষার তখনো বাকি। যিনি তাকে একবার তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই শিক্ষক তাকে ক্ষমা করার ভান করলেন। কিন্তু আদতে তিনি তাকে সবচেয়ে কঠিন আর যত শক্ত শক্ত অঙ্ক দিলেন। রয়েন্টজেন ঘাবড়ে গিয়ে গণনায় ভুল করলেন, আবার গোড়া থেকে শুরু করলেন, তারপর আবার ভুল করলেন। শিক্ষক মহাশয় তাকে কোন সাহায্য করলেন না। শেষে রয়েন্টজেন যখন হাল একেবারে ছেড়ে দিয়েছে, তখন তিনি কর্কশভাবে মন্তব্য করলেন— ব্ল্যাকবোর্ডে কার্টুন আঁকার ব্যাপারে তুমি যে দক্ষতা দেখিয়েছ, তা যদি এখানেও দেখাতে পার, তাহলে তুমি ভালোই করবে।

রয়েন্টজেন আবার ফেল করে বসল। কী গভীর আশায়, কী চরম উদ্বেগের মধ্যে দীর্ঘ এক বছর কাটানোর পর তার বড় হবার সমস্ত স্বপ্ন যেন খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল। স্কুল-ছাড়ার মানপত্র তার ভাগ্যে জুটল না। তার মুখের ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

লেনেপে পিতার আয়-ব্যয়ের কার্যালয়ে বসে রয়েন্টজেন হিসাব-পরীক্ষায় ব্যস্ত থাকে। যেন স্কুলের অঙ্ক কষছে। বাবা বার্লিনে গাঁট গাঁট কাপড় চালান করছেন। মূল্য-তালিকা থেকে গাঁট পিছু মূল্য দেখে দেখে রয়েন্টজেন গাঁটের সংখ্যা দিয়ে গুণ করছিল, তারপর গুণফলটা লিখে রাখছিল বার্লিনের সংস্থাটির 'বিল'-এ। এমন সময় বাবা ঘরে ঢুকলেন। তাঁর সাথে জুরিখের এক ক্রেতা। — এই আমার ছেলে, বাবা পরিচয় করিয়ে দিলেন। — হিসাব-নিকাশের কাজে ও এখন আমায় সাহায্য করছে।

— কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, এ-কাজে ওর তেমন উৎসাহ নেই। ছেলেটির দিকে এক পলক চেয়ে সুইশ পরিদর্শকটি মন্তব্য করলেন।

— ওর খুব ভাগ্য ভালো যে, এমন সুন্দর একটা কাজ পেয়েছে, বৃদ্ধ

লোকটি দুঃখের সঙ্গে জানালেন। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে পরিবারের মুখে তাঁর ছেলে যে চুণকালি মাখিয়েছে, বাবা সে কথা কিছুতেই ভুলতে পারেন না।

— দুঃখের কথা কি বলব, ছেলে স্কুলে পাশ করতে পারে নি।

— কিন্তু দেখে তো মনে হয়, ও বেশ বুদ্ধিমান।

— কিন্তু স্কুলের ছাড়পত্র ছাড়া ঐ বুদ্ধিমত্তা যে কাজে আসছে না। ওর কলেজে পড়ার ইচ্ছে, ইঞ্জিনিয়ার হবার ইচ্ছে।

জুরিখের সেই ভদ্রলোক কাঁধটা একবার ঝাঁকালেন। — মানপত্র আছে কি নেই, তাতে কি আসে-যায়? প্রয়োজনীয় জ্ঞান আছে কি-না, এটাই বড় কথা। জুরিখে আমাদের কাছে ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছ না কেন? সুইশ টেকনিক্যাল কলেজ ও-সব মানপত্রের ধার ধারে না। পড়াশুনায় মেধা আছে কি-না, ক্ষমতা আছে কি-না, ঐটুকুই ওরা দেখে। আর ওদের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করতে হবে।...

উইলহেল্ম রয়েন্টজেন জুরিখের টেকনিক্যাল কলেজের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভালোভাবেই উৎরে গেল। সে এখন পুরোদস্তুর ঐ কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের ছাত্র। তবু মনে যেন ওর শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। পরম আগ্রহের সঙ্গে অধ্যাপকের বক্তৃতা শোনে, পরীক্ষার জন্যে গভীর মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রস্তুতও হয়, অথচ মনের মধ্যে একটা অতৃপ্তির কাঁটা কোথায় যেন খচ খচ করে বেঁধে— জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেন খুঁজে পাওয়া গেল না। অথচ এতদিন ধরে যা খুঁজছিল, তার সবই তো সে পেয়েছে। শিক্ষকদের স্নেহ-ভালোবাসা, অনুগামী ছাত্রদের সুখসঙ্গ, আর মনোরম হ্রদের গা-ঘেঁষা সুন্দরী নগরী যা তার নিজেরই ঘরের মতন আরামপ্রদ এক নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু আঁকা-জোকার কাজগুলো তাঁর যেন কেমন একঘেয়ে লাগত। আজ হোক, কাল হোক, সাধারণ কোন কাজের সাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন ইঞ্জিনিয়ার সে হয়ে উঠবে। কিন্তু এইটুকু কি সব? এর জন্যেই কি তার এত সাধনা! এরই স্বপ্ন কি সে এতদিন ধরে মনে মনে লালন করেছে!

থাকতে না পেরে বার্টা লুড্উইগকে একদিন তো সে প্রশ্নটা করেই বসল। জুরিখের এক সরাইখানার মালিকের মেয়ে এই বার্টা—শান্ত প্রকৃতির তন্বী এক কুমারী। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পাবার পরই ওরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হবে, স্থির হয়ে গেছে।

— এর চেয়ে বেশি তুমি কি প্রত্যাশা করো,' উইলহেল্ম ?— বার্টার কণ্ঠে সান্ত্বনার সুর।— বেশ সুন্দর একটা কাজ জুটবে তোমার, তোমার জীবিকা নির্বাহ হবে আর দিনের শেষে তুমি বাড়ি ফিরে আসবে। আর কি চাই ?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক বলেছ, এই যথেষ্ট। ও উত্তর করল। কিন্তু ওর কণ্ঠে যেন অসন্তোষের সুর।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ। চব্বিশ বছরের যুবক রয়েণ্টজেন শুধুমাত্র দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারই নন, দর্শনের ডক্টরেট উপাধিরও অধিকারী। জুরিখে স্কুলের ছাড়পত্র না দেখিয়েই রয়েণ্টজেন ডক্টরেট উপাধি লাভ করলেন।

তারপর ? যন্ত্রপাতি তৈরির কাজেও তিনি অভিজ্ঞ হয়ে উঠলেন, কিন্তু খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে, এসব কাজে তাঁর তেমন উৎসাহ ছিল না।

আবার একবার এক অকল্পনীয় সুযোগ তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক অগস্ট কুন্দ তাঁকে জিগোস করলেন তুমি কি আমার গবেষণাগারে কাজ করতে চাও ?

— কিন্তু পদার্থবিদ্যার আমি কতটুকুই বা জানি ? অপরাধীর সুর রয়েণ্টজেনের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো স্কুলে পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক প্রায়ই বলতেন, তুমি কিছুই করতে পারবে না।

— তুমি কি করার কথা ভাবছো ?

— তা তো আমি নিজেই জানি না। — রয়েণ্টজেন অকপট চিত্তে জানালেন। পদার্থবিদ্যার কথা আমার মনে কখনো ঠাঁই পায় নি। স্যর, আপনি তো জানেন, আপনার অমন মন-কাড়া বক্তৃতা বা প্রদর্শনীতেও আমি নিয়মিত উপস্থিত থাকতাম না।

বিজ্ঞানী এবার তাঁর অনুসন্ধিৎসু চোখ দু'টি মেলে যুবকটিকে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করলেন। — রয়েণ্টজেন, তোমার মধ্যে পদার্থ আছে, কিন্তু সেটা ঠিক কি, আমি এখনও বুঝতে পারি নি। পদার্থবিদ্যা নিয়ে একবার চেষ্টা করেই দেখো না। কিছু পরীক্ষামূলক কাজে আমার সঙ্গে যোগদান করো। বিষয়টা যে তুমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা করো নি, ওতে কিছু যায় আসে না! খুব সহজেই তুমি ধরে ফেলবে।

সত্যিই তাই। রয়েণ্টজেন অতি সহজেই ধরে নিলেন বিষয়টা। বার্টা লুডউইগ পরম বিস্ময়ে তার প্রেমিকের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করল। কুন্দের

গবেষণাগারে কাজের কথা যখনই উঠত, তখনই তাঁর মধ্যে এক নতুন উত্তেজনা দেখা দিত। সহসা দেখা গেল, প্রভাত আগমনের প্রতীক্ষায় রাত্রির তপস্যা যেন তাঁর আর শেষ হয় না। প্রভাতে কখন তিনি আবার গবেষণাগারের যন্ত্রপাতির মাঝে ফিরে যাবেন, সেই চিন্তায় ছটফট করে মরেন।

— সত্যিই কি ঐ কাজ খুব আনন্দদায়ক? — বার্টার কণ্ঠে সন্দেহের অভিব্যক্তি।

— ওর চেয়ে উত্তেজনামূলক আর কোন কাজ তোমার কল্পনায় আসবে না। এখানে আমি এই ডক্টর উইলহেল্ম রয়েন্টজেন প্রকৃতিকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছি. প্রকৃতি দেবী যদিও স্বল্পভাষিণী, আমি ওঁকে উত্তর দিতে বাধ্য করব। আগে আমিও এসব বিশ্বাস করতাম না, বার্টা। যারা রহস্য-গল্প পড়তে পড়তে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তারা যদি একবার প্রকৃতির অন্তঃপুরের এই রহস্যের সন্ধান পেত, তাহলে বোধহয়, রহস্য-গল্প পড়া ছেড়ে তারাও বিজ্ঞান-কর্মে নিজেদের নিযুক্ত করত। তোমাকে একটার পর একটা পরীক্ষা চালিয়ে যেতে হবে এবং তোমার মনে হবে, সযত্ন-রক্ষিত কোন্ রহস্যের পেছনে গোয়েন্দার মতই তুমি ছুটে চলেছ।

এক-এক ধাপ করে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে তোমায় অগ্রসর হতে হবে, যতক্ষণ না আলোক এসে সমস্ত অন্ধকার ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং তুমি নিশ্চিত উত্তরের সামনে এসে দাঁড়াও। এই পরম আনন্দদায়ক অনুভূতিকে আমার ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না, বার্টা। অসীম অনন্ত সুখের এ এক বিস্ময়কর অনুভূতি।

— না, তুমি বেশ বদলে গেছ। বার্টা লুডউইগ্ জানাল। আগে তোমাকে এমন তো দেখি নি, উইলহেল্ম। তুমি যেন এখন উৎসাহ আর দুর্বার সাহসের প্রতিমূর্তি!

— হ্যাঁ, আমাদের গবেষণাগারে দিনের পর দিন প্রকৃতির সঙ্গে আমি যুদ্ধে লিপ্ত। শুধু এই যুদ্ধের হাতিয়ার অন্য ধরনের, অস্ত্রশস্ত্র আলাদা। তরবারি আর বন্দুকের বদলে আমাদের হাতিয়ার পেন্সিল, গণিতের কয়েকটি তালিকা আর বায়ুশূন্য কয়েকটি কাচের নল। আমি বাজি রাখতে পারি, তুমি এই বায়ুশূন্য নল কি, তাই জান না।

— না।

— আচ্ছা, এসো বার্টা, বায়ুশূন্য কাচের নলের সঙ্গে তোমার সরাসরি পরিচয় করিয়ে দিই।

— কি, এখানে, এই মেলায়? বার্টা জিগ্যেস করল।

জুরিখের সরকারী উদ্যানে ওরা বেড়াচ্ছিল। উদ্যানে উদ্যোগী লোকেরা মিলে নানা রকম ক্রীড়া-কৌতুকের আয়োজন করেছিল, নানা রকম কসরতের একটা ছোটোখাটো প্রদর্শনী গড়ে তুলেছিল। বড় বড় হরফে পোষ্টার পড়েছিল— নতুন খেলা, রঙ্গীন খেলা, রহস্যময় খেলা। মস্ত একটা ভিড় জমে উঠেছিল সেখানে।

আর একটু এগোতেই আমন্ত্রকের ভাঙাকণ্ঠের স্বর ওঁদের কানে গেল। —উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী, জনতাকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করা হচ্ছে— আপনাদের সামনে সর্বাপেক্ষা আধুনিক, ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক উপহারটি এনে হাজির করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। উপহারটি হলো এই নলগুলি; যা নিজে নিজেই চমকপ্রদ রশ্মি বিকিরণ করে। রহস্যজনক এই নলগুলো রামধনুর সাত রঙে বিচ্ছুরিত হয়। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা মাত্র দশ বার এ-যুগের সবচেয়ে মনোহর দৃশ্য দেখতে পাবেন।

জনতার স্রোত ভেঙে পড়ছে ওর চারপাশে। এক মুহূর্তের জন্য কালো মাথার অরণ্যের মধ্য দিয়ে বার্টা এক পলক কয়েকটা কাচের নলের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। নলগুলি থেকে আলোকের প্রতিদীপ্তি চোখে পড়ল; নীল সবুজ হলুদ বেগুনী লাল। — তা হলে এইগুলোর ওপরই প্রয়োগশালায় তোমার সময় অতিবাহিত হয়? ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বার্টা প্রশ্ন করল। তোমার লজ্জা করে না, উইলহেল্ম? নিজেকে তুমি বিজ্ঞানী বলে মনে কর, না যাদুকর? মেলায় এই যাদু নলের ক্রিয়াকলাপ বেশ ভালই লাগে, কিন্তু নিশ্চয়ই ওগুলোকে অতো গুরুত্ব দেবার কিছু নেই?

স্বভাবে গম্ভীর রয়েন্টজেন উচ্চহাস্যে ফেটে পড়লেন। — এর সবটুকুই পদার্থবিদ্যার বিষয় এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এক হিসেবে আমারও যাদুকর, তফাৎ কেবল এইটুকু, এখানকার এই লোকগুলোর মত আমরা আমাদের বুদ্ধিপ্রসূত বিষয়গুলোর অমন বিজ্ঞাপন দিই না। কিন্তু লোকগুলো কি বোকা নয়? হিটর্ফক্রুকের একটা বিসর্জন নল দেখার জন্যে কত ঠেলাঠেলি

করছে, কত পয়সাই না খরচ করছে। প্রয়োগশালায় আমরা ওদের আরও দু'-একটা জিনিস দেখাতে পারি। কিন্তু বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে বা গবেষণা সম্বন্ধে কারুরই তেমন আগ্রহ নেই। বার্টা, এই নলগুলো নিয়ে কিছুদিন ধরে আমি কাজ করছি। খুব ভালোভাবে ওদের জানার মত সময় এখন আমার হাতে নেই, কিন্তু ইচ্ছে আছে, ওদের নিয়ে একদিন উঠে পড়ে লাগব।

— সত্যি, ওগুলো খুব চমৎকার দৃশ্য। কিন্তু নলগুলোর এই চমক, এই দীপ্তি আসছে কোত্থেকে?

— এই নলগুলো সম্বন্ধে অনেক তথ্যই এখনো আমাদের অজানা, রয়েন্টজেন বললেন। — বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী ঐ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। তাঁরা কিসের অনুসন্ধানে ব্যস্ত, আমি তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করব। সমস্ত বিষয়টা দানা বেঁধে ওঠে, যখন গাইস্লর নামে বন্-এর এক কাচের কারিগরের মাথায় বায়ুশূন্য নল তৈরির ভাবনাটা দেখা দেয়। তৈরির সময় এই নলগুলো থেকে প্রায় সমস্ত বাতাসই বার করে দেওয়া হয়। কারিগরটি ছিল খুবই মেধাবী; নলগুলো থেকে বাতাস বার করার জন্যে পারদ পাম্পও ও আবিষ্কার করে বসে। পরবর্তীকালে জুলিয়াস প্লুকর ও তাঁর শিষ্য জোহান উইলহেল্ম হিটর্ফ নামে দু'জন জর্মান বিজ্ঞানী ওগুলোর ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। ওঁরা কয়েক শ' ভোল্টের তড়িৎপ্রবাহ ঐ বায়ুশূন্য নলগুলোর মধ্যে দিয়ে প্রেরণ করেন। স্কুলের পড়াশুনার মধ্যে থেকেই তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে, বার্টা, আবেশ যন্ত্রের দুই প্রান্তে তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করলে সাধারণ বাতাসের কি প্রতিক্রিয়া হয়! বাতাসে স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়। অন্য কথায়, একটা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ এদিক থেকে ওদিকে লাফায়। কিন্তু গাইস্লরের নল হিটর্ফকে বিস্ময়াভিভূত করে তুলল। তিনি তারের দু'টি প্রান্ত নলের কাচের গায়ে সেঁটে দিলেন, নল থেকে যতদূর সম্ভব বাতাস টেনে বার করে দিলেন, তারপর তারের অপর প্রান্ত দু'টি দুই বিপরীত তড়িৎমেরুর সঙ্গে যুক্ত করলেন। কি ঘটল? একটা ইলেকট্রড থেকে অপর ইলেকট্রডে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে গেল না। দেখা গেল, ধনাত্মক প্রান্ত সংলগ্ন কাচের দেওয়ালটা সবুজ আলোয় প্রদীপ্ত হচ্ছে। একটা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের রশ্মি আবিষ্কৃত হলো। ক্যাথড অর্থাৎ ঋণাত্মক প্রান্ত দ্বারা সৃষ্ট বলে ওকে বলা হলো ক্যাথড রশ্মি। ঐ রশ্মি নিজে অদৃশ্য, কিন্তু নলের অপরদিকের দেওয়ালটা প্রদীপ্ত করায় ওর উপস্থিতি

ধরা পড়ল। আরও বড় কথা, ঐ প্রদীপ্তি নলের মধ্যেকার গ্যাসের ওপর নির্ভর করে। গ্যাস অনুযায়ী ঐ প্রদীপ্তি কখনো হলুদ, কখনো সবুজ, কখনো লাল, কখনো বা নীল। আমি নিজেই তা পরীক্ষা করে দেখেছি, একটা কাচের পাতে খড়িমাটি চূর্ণ রেখে ওকে তড়িৎ প্রবাহের সঙ্গে সংলগ্ন করে দেখেছি অপূর্ব নীল আলোকের দীপ্তি।

— আমার কাছে এটা এখনো ধেড়ে-খোকাদের খেলনা বলেই মনে হচ্ছে। বার্টা মন্তব্য করল। অপূর্ব সুন্দর নীলাভ রং দেখার জন্যে তোমার ঐ ক্যাথড রশ্মির প্রয়োজন কি, উন্মুক্ত আকাশের দিকে চোখ তুলে চাইলেই পারো।

কিন্তু রয়েন্টজেনের কথা যেন ফুরোয় না। ওঁর উৎসাহে যেন ভাঁটা নেই। উনি ওঁর প্রেমিকাকে বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যর উইলিয়ম ক্রুক্স সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। উইলিয়ম ক্রুক্স হিটর্ফের বায়ুশূন্য নলের উন্নতি সাধন করেন এবং ক্যাথড রশ্মির ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। ক্রুক্সের মতে, তিনি বোঝাতে লাগলেন বিকিরণ পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। ভবিষ্যতে মানুষ পদার্থকে কঠিন, তরল, বায়বীয় ও বিকীর্ণ অবস্থা হিসেবে বিভক্ত করে দেখাবে।

— এ সব কি আনন্দদায়ক বলে তোমার মনে হয় না? রয়েন্টজেন উচ্চারণ করলেন। এখন সমস্যা হলো ; এই বিকিরণ কি ভাবে ঘটে? ঋণাত্মক দণ্ড থেকে ধনাত্মক দণ্ডে অদৃশ্য কি চলে যায়? তড়িৎ প্রবাহই বা বস্তুত কি? এ-সব প্রশ্নের আদি-অন্ত নেই। প্রশ্নগুলো তখন তোমায় পেয়ে বসবে, তুমি চাও আর না চাও। আমি তো বুঝতে পারি না, প্রকৃতির এ সব রহস্য উদ্ঘাটিত করতে না চেয়ে কিভাবে বাঁচা যায়। এ নেশায় একবার মজলে আর ছাড়তে পারবে না। আমার মত সর্বস্বান্ত হয়েও ডুবে থাকতে হবে।

বার্টা গভীর ভালোবাসায় ওঁর হাতটা একবার মোচড় দিল। ক্যাথড রশ্মি বা বায়ুশূন্য নল সম্বন্ধে ওর কোন ধারণা নেই। কিন্তু ও বুঝতে পারল, উইলহেল্ম তাঁর ঠিক কাজ খুঁজে পেয়েছে।

এরপর মনে হলো অধ্যাপক কুন্দের গবেষণাগারে রয়েন্টজেনের যে শিক্ষা জীবন শুরু হয়েছিল, তা বুঝি হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। ওঁর অধ্যাপক উর্জবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োগ বিষয়ক পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক পদটি গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রিত হলেন। গেরিতে হলেও অধ্যাপক কুন্দ কিন্তু তাঁর এই অল্পবয়স্ক

সহকারীটির প্রতি গভীর আস্থা স্থাপন করে ফেলেছেন। তিনি জানালেন, রয়েন্টজেনকে সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুমতি দিলে তিনি উর্জবুর্গের ঐ পদ গ্রহণ করতে পারেন। উর্জবুর্গের থেকে কোন বাধা এল না। এরপর আরও অনেক পত্র বিনিময় হলো। স্থির হলো, বিজ্ঞান মহলে ক্রমবর্ধমান খ্যাতি সম্পন্ন এই অল্পবয়স্ক পদার্থবিদ্ রয়েন্টজেন তাঁর স্বদেশেই গবেষণা চালাতে পারবেন। শুধু তাই নয়, শিক্ষকতাও করবেন। কারণ রয়েন্টজেনকে পদার্থবিদ্যার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করার জন্য কুন্দ উর্জবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেন।

উর্জবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ডিন জুরিখ থেকে প্রেরিত রয়েন্টজেনের ব্যক্তিগত নথি-পত্রের ওপর চোখ বোলাচ্ছিলেন। সহসা তিনি উঠে বসলেন। যেন নিজের চোখকেও তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। এও কি সম্ভব— এই রয়েন্টজেন, যাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ আসনে বসানো হয়েছে তাঁর স্কুলের ছাড়পত্রও নেই! তাইতো দেখছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন নি।

এক সপ্তাহ বাদে এই সংবাদ কানে যেতে বার্টা ক্ষোভে দুঃখে ভেঙে পড়ল। কি বলে সে তার প্রেমিককে সান্ত্বনা দেবে? অপরদিকে নৈরাশ্যে, ক্রোধে উন্মাদগ্রস্ত রয়েন্টজেন। আর কতদিন, বহুদিন আগের উট্রেক্টের এক সতীর্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করায় তাঁকে এভাবে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে? হল্যাণ্ডের এক গণিত শিক্ষকের ঘৃণার পাত্র ছিলেন বলে, জর্মানিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা জীবন তাঁর চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে যাবে? তিনি কি এতদিনেও প্রমাণ করেন নি যে স্কুলের ছাড়পত্র ছাড়াই তিনি বিজ্ঞানকর্মে যথেষ্ট উপযুক্ত!

তাঁর পরম সান্ত্বনা— অধ্যাপক কুন্দ' কিন্তু সব সময় তাঁর পাশে পাশে আছেন। যেহেতু উর্জবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় রয়েন্টজেনকে রাখতে চাইল না, কুন্দও অধ্যাপক-আসন থেকে পদত্যাগ করলেন। কয়েকবছর পরে স্ট্রাস্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কুন্দের এক নিমন্ত্রণ এল। তিনি এবার আগে থেকেই জানিয়ে দিলেন, রয়েন্টজেনের স্কুলের ছাড়পত্রের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যদি তাঁকে শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তা হলেই তিনি ঐ পদ গ্রহণ করতে পারেন।

ষ্ট্রাস্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তাতে কোন অসুবিধা দেখা দিল না। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রয়েন্টজেন সেখানে তাঁর প্রথম বক্তৃতা দিলেন। সমস্ত বাধা কেটে গেল! পাঁচ বছর পরে জর্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জীবনে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল। গিয়েসেন বিশ্ববিদ্যালয় উইলহেল্ম রয়েন্টজেনকে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করল, যদিও ছাত্র হিসেবেও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা শোনার যোগ্যতা ওঁর ছিল না। কিন্তু এর চেয়েও বিস্ময় ওঁর ভাগ্যে অপেক্ষা করেছিল। অষ্ট দশকে ওঁর তড়িৎ বিষয়ে গবেষণা ওঁকে শিক্ষাজগতের খ্যাতির এমন শীর্ষে নিয়ে গেল যে, উর্জবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ও ওঁকে অধ্যাপক রূপে বরণ করে নিল। এই উর্জবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ই দশ বৎসর পূর্বে ওঁকে শিক্ষকরূপেও যোগ্য বলে মনে করে নি।

রয়েন্টজেন কিন্তু প্রতিহিংসা পরায়ণ মানুষ ছিলেন না। তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। উর্জবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তিনি তড়িৎপ্রবাহের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর উপযোগী সর্বাধুনিক প্রয়োগাশলার খোঁজ পেলেন। তাঁর আশা হলো, এখানে তিনি তাঁর সমস্ত প্রশ্নের জবাব পাবেন - তড়িৎ-প্রবাহ কি? কিসের সমন্বয়ে এই তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি? এবং কি ভাবে তড়িৎপ্রবাহ ঘটে?

সাত বছর হলো রয়েন্টজেন ও তাঁর পত্নী বার্টা প্লিচারিং-য়ের প্রাচীন সুন্দর অট্টালিকায় এসে উঠেছেন। দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম আজ সুফল প্রসব করছে। বিজ্ঞান মহলে অধ্যাপক রয়েন্টজেন আজ সুপরিচিত। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে তিনি এখনো তেমন আঁচড় কাটতে পারেন নি। তড়িৎপ্রবাহ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কতটুকুই বা জ্ঞান? জানার কতটুকুই বা আগ্রহ? এডিসনের বিজলী বাতিকে তারা প্রশংসা করেই সন্তুষ্ট, কিন্তু বিদ্যুতের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার পশ্চাতের রহস্যময় কার্য-কারণ বিষয়টি এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নতুন নতুন কারখানায় কার্বন সুতোর বাতি হচ্ছে, যা বহু পরিচিত গ্যাস বাতির স্থান দখল করে নিচ্ছে। কিন্তু কোন রহস্যময় শক্তির প্রভাবে কাচের বালবের মধ্যেকার সুতোটি জ্বলে ওঠে, অত শত জানার জন্যে কারুরই তেমন মাথা-ব্যথা নেই। শ্রীমতী বার্টা যে তলায় বসে স্বামীর জন্যে রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকত, তার দু'টি তল নিচে রয়েন্টজেন তাঁর প্রয়োগ-শালায় কাজ করতেন। জুরিখে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বায়ুশূন্য প্রোজ্জ্বল

নল। এবার তিনি ঐ নিয়ে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর সময় পেলেন। প্রতিদীপ্ত ঐ নলগুলো সে দিন ছিল তামাসার কেন্দ্র, কিন্তু প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সাম্প্রতিককালের বিস্ময়কর ফলাফল ঐ তামাসাগুলোকেও যেন ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে পশ্চাতে ঠেলে দিল।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরের এক শীতের দিন। পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ অধ্যাপক সবেমাত্র গবেষণাগারের সহকারী মোসাণ্ডকে আর এক টুকরো কাঠ আগুনে দিতে বলেছেন।

লম্বা কালো দাড়ি আর এক জোড়া ঘন কালো গোঁফের এই মানুষটি ছিল সকলের বিশেষ শ্রদ্ধেয়, সম্মানীয়। ওনার পরনে থাকতো কালো কোট আর কালো টাই! সন্ধ্যায় বাইরে বেড়াতে বেরুনোর সময় কাঁধে চাপাতেন কালো এক মস্ত ওভারকোট আর মাথায় ঘন কালো একটা টুপি— এত বড় যে চোখ দুটোও প্রায় ঢাকা পড়ে যেত।

উর্জবুর্গের প্রতিটি শিশুও এই বিজ্ঞানীকে চিনত। সামনে পড়ে গেলে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে লোকে পাশে সরে দাঁড়াত। বন্ধুত্বপূর্ণ অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে তিনি এই শ্রদ্ধায় সাড়া দিতেন। স্কুলের ছেলেদের পথের মধ্যে দাঁড় করিয়ে তিনি প্রায়ই জিগ্যেস করতেন— কেমন পড়াশুনা চলছে? ওদের অসুবিধার কথা শুনলে উনি গভীর স্নেহে ওদের সান্ত্বনা দিতেন। নিজের স্কুল-জীবনের দুঃখের দিনগুলোর কথা ওদের জানাতেন। উর্জবুর্গের সেনাবাহিনী পর্যন্ত রয়েন্টজেন ও তাঁর বিজ্ঞানকর্মকে শ্রদ্ধা জানাতো। প্লিচারিং-য়ের পদার্থ বিজ্ঞান-সংস্থাপনের পাশ দিয়ে কুচকাওয়াজ করে যাবার সময় সৈন্যদল যাতে হৈ চৈ না করে, সেইজন্য আদেশ জারি করা হয়েছিল।

নভেম্বর মাসের ঐ দিনটিতে রয়েন্টজেনের প্রয়োগশালার সমস্ত জানলা কালো পর্দা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। ঘরে রয়েন্টজেন ক্যাথড-রশ্মি নিয়ে পরীক্ষায় নিমগ্ন ছিলেন। সহকারী মোসাণ্ডের সতর্ক দৃষ্টি ছিল যাতে ওনার ঘরে আলোকের একটি রশ্মিও না ঢোকে। পারদ পাম্প সংযুক্ত ক্রুক্‌সের নল, তড়িৎপ্রবাহের যন্ত্র ও অন্যান্য সকল সাজসরঞ্জামও গত কয়েকদিনের মত অধ্যাপকের হাতের কাছেই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল।

— সব প্রস্তুত? রয়েন্টজেন প্রশ্ন করলেন। বাতি নিভিয়ে এবার তড়িৎ-প্রবাহ চালু করতে পারি?

— এক মিনিট, স্যর। আপনি হাতের আংটিটা খুলতে ভুলে গেছেন।

মোসাণ্ড ঠিকই ধরেছে। যখনই রয়েন্টজেন পারদ পাম্প নিয়ে কাজ করেন, তখনই বিবাহের আংটিটা খুলে রাখেন, পাছে ওটা পারদের সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যায়। আংটিটা খুলে তিনি কালো মোড়কে মোড়া ফটোর কাগজপত্রের ওপর রাখা একটা কাঠের বাক্সের ভেতব রাখলেন।

বাতিটা নিভিয়ে অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন রয়েন্টজেন। কি আবিষ্কারের আশা করছেন, তা নিজেও তিনি নিশ্চিতরূপে জানতেন না। বায়ুশূন্য ঐ নলগুলো এক দুর্নিবার আকর্ষণে তাঁকে টানছে— যদিও বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী ক্যাথড-রশ্মি নিয়ে বেশ কিছুদিন কাজ করেছেন এবং এর সম্বন্ধে ওঁদের অভিমত নতুন কিছু আর জানার নেই, মূলতঃ নতুন কিছু তো নয়ই। তাহলে এই নলগুলোর মধ্যে দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ পাঠানোর অর্থ কি বৃথা সময় নষ্ট করা নয়?

কিন্তু নিজেকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারছেন না রয়েন্টজেন। নিজেও জানেন না, কিসেব মোহে তিনি বার বার ঐ নলগুলোর পেছনে ধাবিত হচ্ছেন।

— এবার তড়িৎপ্রবাহ চালু করুন, স্যর! মোসাণ্ডের কণ্ঠস্বর ওঁর চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে দিল।

রয়েন্টজেন তড়িৎপ্রবাহ চালু করলেন। এবার তিনি নতুন কিছু পরীক্ষা করলেন। তড়িৎ প্রেরণ-যন্ত্রটিকে তিনি কালো কাগজে ভালো ভাবে মুড়লেন। নিজেও জানেন না, কেন? হঠাৎ এ-ভাবনাটা তাঁর মাথায় এসেছিল।

কিছুক্ষণ পরে তিনি তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ করে দিলেন। প্রয়োগশালার বাতিটা আবার জ্বালালেন। অসাধারণ তেমন কিছু ঘটে নি। অসম্ভব কিছু ঘটবে, এমন তিনি আশাও করেন নি। তা ছাড়া, দেরি হয়ে যাচ্ছে, বার্টা হয়তো খাবার নিয়ে তাঁরই প্রতীক্ষা করছে।

ছোট কাঠের বাক্সটা রয়েন্টজেন তুলে নিলেন এবং আংটিটা বার করলেন। আংটিটা বার করতে গিয়ে তাঁর ফটোর কাগজগুলোর ওপর নজর পড়ল। মনে পড়ল, আগের দিনের পরীক্ষার কতকগুলো ফটো পরিস্ফুটন করা হয় নি। কোন কাজ ফেলে রাখার লোক নন রয়েন্টজেন। তিনি পরিস্ফুটকটি নিয়ে বাতিটা নিভিয়ে কাগজের মোড়কটা খুললেন।

কয়েক মিনিট পরে অন্ধকার ঘরের আবছা লাল আলোয় ফটোগুলো পরীক্ষা করতে করতে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। কাগজের স্তূপের মধ্যে যেটির ওপর আংটির কাঠের বাক্সটা ছিল, সেই কাগজটির গায়ে বিবাহের আংটিটির সুস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে।

—কি ঘটে গেল এখানে? মোসাগুকে প্রশ্ন করলেন রয়েণ্টজেন। আমি যখন নল নিয়ে পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলাম, তুমি কোন আলোক-রশ্মি ঢুকতে দাও নি তো?

তাঁর সহকারী সবরকম শপথ বাক্য উচ্চারণ করে নির্দ্বিধায় জানালেন, তিনি তেমন কিছুই করেন নি। রয়েণ্টজেনও বুঝতে পারলেন, তাঁর সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে কোন আলোক-রশ্মিই প্রয়োগশালায় প্রবেশাধিকার পায় না। তাছাড়া, আলোকচিত্রের কাগজগুলো তো পুরু কাল কাগজে মোড়া ছিল, উজ্জ্বলতম আলোও তো ওর মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না। তা হলে মোসাগুের কাজের কোন ত্রুটি হয়নি। কোন অজানা, রহস্যপূর্ণ কারণ এই ভৌতিক ব্যাপারে কাজ করেছে। তাঁর আংটিটা তো কাঠের বাক্সে ছিল। আলোক চিত্রের কাগজে ওর ছবি উঠল কি করে? এটা কি তা হলে ক্যাথড-রশ্মিরই কারসাজি? নিশ্চয়ই নয়। কারণ, প্রথমত ওদের দূরত্ব অনেক কম ছিল এবং দ্বিতীয়ত ওরা নলের চার পাশের মোড়ক ভেদ করে কখনই যায় নি! সুতরাং ক্যাথড-রশ্মি ঐ ছবির কারণ নয়। অন্য কি ঘটল তাহলে!

রয়েণ্টজেন চিন্তায় এমনই আত্মনিমগ্ন যে মোসাগুের রাত্রির বিদায়-সম্ভাষণ তাঁর কানে পৌঁছলই না। আহারের সময় অনেকক্ষণ হলো অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু অধ্যাপকের ক্ষুধা-তৃষ্ণার বুঝি কোন তাগিদ নেই। কালো কাগজে মোড়া বায়ুশূন্য নলের মধ্যে দিয়ে তিনি তড়িৎ-প্রবাহ প্রেরণ করেই চলেছেন—একবার, আরো একবার, বার বার।

পরমাশ্চর্য এক আবিষ্কার তিনি করে ফেললেন সেদিন। ওঁর নলের কিছুদূরে ছিল একটা প্রতিদীপ্ত পর্দা—কাচের পর্দা, তার ওপর একটা রাসায়নিক পদার্থ মাখানো, যাতে বিশেষ রশ্মি পড়লে ওটা প্রতিদীপ্ত হয়। যতবারই রয়েণ্টজেন নলের ভেতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ পাঠান, প্রতিদীপ্ত পর্দাটা, কি জানি কোন রহস্যজনক কারণে ততবারই হলুদ আলোয় ঝিক্‌মিকিয়ে ওঠে।

ক্যাথড-রশ্মি প্রতিদীপ্ত পর্দায় এসে পড়েছে— এ-প্রশ্নই ওঠে না। কারণ

ক্যাথড-রশ্মির দৌড় ঐ নলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তা ছাড়া কালো কাগজের মোড়ক ভেদ করে ওর যাওয়া সম্ভব নয়। কয়েক ফুট দূরের পর্দার ওপর পতিত ঐ অপরিচিত রশ্মিগুলো তা হলে কি, যা ঐ পর্দাটাকে অমন আলোকে উদ্ভাসিত করছে? আরো আগে জানার বিষয়ঃ কোত্থেকে ওদের আবির্ভাব।

এক বছর পর আমেরিকার কোন এক সংবাদপত্রের এক রিপোর্টার রয়েন্টজেনকে এক অদ্ভুত প্রশ্ন করেন— ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বরের ঐ স্মরণীয় দিনে আপনি কি চিন্তা করছিলেন স্যর?

দায়িত্বজ্ঞানপূর্ণ বিচক্ষণ বিজ্ঞানীর মতই উত্তর দিয়েছিলেন রয়েন্টজেন— নিশ্চিত না হয়ে আগেভাগে কোন অপরিণত সিদ্ধান্তের কথা জানাতে তিনি রাজি নন।

— কিছুই ভাবছিলাম না আমি, রয়েন্টজেন সহজ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, আমি অনুসন্ধান করছিলাম। অনুমান করেছিলাম, নিশ্চয়ই সমস্ত ব্যাপারটা নল থেকে উদ্ভূত হচ্ছে, আমি তাই সমস্ত মনোযোগ ওর ওপর নিবদ্ধ করলাম। শীঘ্রই সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটালাম। বার বার পরীক্ষাটা চালালাম। ধীরে ধীরে নল ও প্রতিদীপ্ত পর্দাটার দূরত্ব বাড়িয়ে ছ'ফুট পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। কিন্তু একই ব্যাপার দাঁড়াল। প্রথমটা আমি বিকিরণকে এক নতুন ধরনের আলো হিসেবে গণ্য করলাম। এখন আমার দৃঢ় ধারণা জন্মেছে, এটা সম্পূর্ণ নতুন অন্য কিছু— ওর সম্বন্ধে এখনো আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা নেই।

— কিন্তু ওটা কি আলোক নয়? রিপোর্টার প্রশ্ন করলেন।

— না, ওটা আলোক নয়। কারণ ওটা আলোকের মত প্রতিফলিত হয় না, প্রতিসরিত হয় না।

— ওটা কি তড়িৎশক্তি?

— তড়িৎশক্তি বলতে আমরা যা বুঝি, ওটা ঠিক তাও নয়।

— তা হলে ওটা কি?

— আমি এখনও ঠিক বলতে পারছি না। রয়েন্টজেন জানালেন।

* * * *

কিন্তু ঐ সাক্ষাৎকারের আগে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বরের ঐ রাত্রিতে রয়েন্টজেন ঐ রশ্মির প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও অনেক অল্পই ধারণা করতে

পেরেছিলেন! সর্বপ্রথম ওঁর এই ধারণা হয়েছিল যে ঐ রশ্মি নলের চারিপাশের ঢাকা কাগজ ভেদ করে যাচ্ছে— সাধারণ আলোক-রশ্মি অতো পুরু কাগজ ভেদ করতে পারে না। অতএব মূল প্রশ্ন দাঁড়াল ; ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ওপরে এই রশ্মির প্রভাব কি ধরনের হবে।

সেল্‌ফ থেকে এক হাজারের ওপর পৃষ্ঠার একটা পুরু বই নিয়ে তিনি ঐ নল ও পদার্থের মধ্যে ধরলেন। পদার্থটা তখনও প্রতিদীপ্তি ছড়াচ্ছে, যদিও আলোটা একটু স্তিমিত। বইটার পুরু স্তর স্বভাবতই রশ্মির নির্গমন পথে কিছু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। রয়েণ্টজেন এবার প্রায় এক ইঞ্চি পুরু পাইন কাঠের টুকরো নিয়ে পরীক্ষা করলেন। রশ্মিটা অনায়াসে ওর ভেতর দিয়ে চলে গেল। একটা টিনের পাতের মধ্যে দিয়ে যাবার সময়ও ঠিক একই জিনিস ঘটল। কিন্তু পর পর কতকগুলো টিনের পাত রেখে দেখা গেল, পর্দায় একটা আবছা ছায়া পড়ছে। রয়েণ্টজেন তামা, রুপো ও প্ল্যাটিনামের পাত রেখেও পরীক্ষাটার পুনরাবৃত্তি ঘটালেন— প্রতিবারেই পর্দাটা প্রতিদীপ্ত হলো, যদিও ধৃত ধাতুর ঘনত্ব অনুসারে আলোকের ঔজ্জ্বল্য কখনো বেশি, কখনো বা কম।

অবশেষে রশ্মি ওর জুড়ি খুঁজে পেল। একটা সীসার পাত ওর নির্গমন সম্পূর্ণ রোধ করে দিল! কালো আঁধারে পর্দা ঢাকা পড়ে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ নিথর নিশ্চল হয়ে রইলেন রয়েণ্টজেন। সীসের পাতটা হাতেই ধরে রইলেন। তা হলে এই রশ্মিটা কি ·· যা কাগজ, কাঠ, রবার কি অ্যালুমিনিয়মের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে অথচ কেবল সীসের পাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়!

এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা করে বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল, কিন্তু চিন্তায় ভাবনায় সম্পূর্ণ ধ্যানস্থ রয়েণ্টজেনের কাছে মনে হলো যেন কয়েকটা মুহূর্ত, কয়েক মিনিট। ওপরতলার প্রতীক্ষা-রতা মহিলাটির কথা তিনি সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন। আগের চেয়ে তিনি যেন আজ অনেক বেশি সুখী। সকল বিজ্ঞানীর ভাগ্যেই যা জোটে, সেই দুর্লভ বস্তু বিজ্ঞানী রয়েণ্টজেনের জীবনে আজ সমাগত— সম্পূর্ণ অচেন', অজানা, অপরিচিত এক নতুন জগতের সন্ধান।

ক্লান্তিহীন নিরলসভাবে রয়েণ্টজেন পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালিয়ে গেলেন। সহসা তাঁর মনে হলো, সেই রহস্যময় হলুদ প্রতিদীপ্তিতে দীর্ঘ পর্দাটা যেন

সাজা দাঁড়িয়ে নেই। বাতিটা নিভিয়ে তিনি ওটাকে সোজা করে দাঁর করাতে গেলেন। রশ্মির বিকিরণ পথের মধ্যে দিয়ে তাঁর নিজের হাতটা এক মুহূর্তের জন্যে চলে গেল।

যা দেখলেন, তাতে তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। অনেকক্ষণ তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেন। চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি কি তা হলে স্বপ্নাবিষ্ট? পর্দায় ওটা ওঁর নিজের হাত নয়? নিজের হাতই তো, অথচ কী কিম্ভূতকিমাকার ওর মূর্তি। কোন দুষ্টু যাদুর খপ্পরে পড়েন নি তো? এ কোন পৈশাচিক রশ্মি, যা তাঁর হাতের মাংস পেশীগুলো শুষে নিয়ে কেবল হাড় ক'খানা প্রতিদীপ্ত পর্দায় তুলে ধরেছে! এ-রশ্মি যেন তাঁর জ্যান্ত হাতখানাকে মড়ার হাতে পরিণত করেছে।

দেহের নরম অংশের মধ্য দিয়ে চলে যায় অথচ হাড় ভেদ করে যেতে পারে না— এই রশ্মির তিনি নাম দিলেন 'এক্স-রে'। এমন রশ্মি সম্বন্ধে যেহেতু আগে কোন জ্ঞান ছিল না, গাণিতিক সমীকরণের 'এক্স'-এর মতই যেহেতু রহস্যপূর্ণ ওর অবস্থান, সেইজন্য ওর অমন নামকরণ করা হলো। গাণিতিক সমীকরণের মতই দীর্ঘ ও বিস্তারিত হিসাব করলেই জানা যাবে।

দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে রয়েণ্টজেন এবার তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করে দিলেন। তারপর জানালার কাছে ছুটে গিয়ে পর্দাটা সরিয়ে দিলেন। সকালে মনোরম আলো জানালার কাচ বেয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

৯ই নভেম্বরের প্রভাত। বার্টার ঘরে এসে প্রবেশ করলেন রয়েণ্টজেন।

দু'চোখে বিনিদ্র রাত্রির ক্লান্তি অথচ অন্তরে এক তীব্র অগ্নি দহন।— তুমি কি অসুস্থ? তোমার জ্বর হয়েছে না কি?— বার্টার প্রথম প্রশ্ন।

— না। তিনি ওঁকে নিশ্চিন্ত করলেন। জানো, আমি আজ খুব সুখী। তিনি বললেন।— কিন্তু লক্ষ্মীটি, কেন, জিগ্যেস করো না। কিছু একটা ঘটে গেছে! কিছুক্ষণ পরে আবার বললেন— সকলেই বলছে, অধ্যাপক রয়েণ্টজেন পাগল হয়ে গেছে। ভয় পেয়ো না। আমি বেশ ভালো আছি।

এই কথা ক'টা উচ্চারণ করে রয়েণ্টজেন নিজের ঘরে গেলেন। তারপর বিছানায় শুতে না শুতেই গভীর ঘুমে ডুবে গেলেন। হাজারো প্রশ্নের ঝড় বয়ে যাচ্ছে বার্টার মনে, কিন্তু তিনি তাঁকে কোনটাই জিগ্যেস করতে পারলেন না।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ও জুটল না। কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে, কোন কথা না বলে রয়েণ্টজেন আবার গবেষণাগারে গিয়ে বসলেন। খাবার পরিবেশন করে অপেক্ষা করা হলো, কিন্তু গৃহস্বামীর দেখা নেই। শ্রীমতি বার্টা ঝিকে পাঠালেন, ওঁকে ডেকে আনতে। অধ্যাপক বলে পাঠালেন— 'আটকে গেছি, যেতে দেরি হবে। পড়ার ঘরে একটা ট্রে করে খাবারটা কি পাঠিয়ে দেওয়া যায়? তাই করা হলো। সন্ধ্যা নাগাদ ঝি মোসাগুকে খাবার জন্যে আবার যখন ডাকতে এলো তখনও রয়েণ্টজেন তাঁর মধ্যাহ্ন ভোজন সারেন নি। খাবার তেমনি ঢাকা পড়ে আছে। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি গভীর হলো, কিন্তু রয়েণ্টজেন ঘরে ফিরলেন না। শ্রীমতি বার্টা বেপোরোয়া। যতক্ষণ না ফেরে, ততক্ষণ তিনিও বিনিদ্র রজনী যাপন করে যাবেন, তাতে যদি রাত্রির পর ভোরের সূর্য ওঠে, উঠুক। কিন্তু অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করে ক্লান্তিতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভোরের দিকে অধ্যাপক ঘরে ফিরলেন। অস্বস্তিকর ঘুম থেকে উঠে বার্টা স্বামীকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন— অপ্রীতিকর কিছু তুমি আমার কাছে গোপন করে যাচ্ছ, উইলহেল্ম! আমাকে বিশ্বাস করছো না কেন?

— বার্টা, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠা সহধর্মিনী তুমি। তিনি বললেন— কিন্তু আমায় আর একটু সময় দাও। আমার আবিষ্কৃত বিষয়টি তুমিই সর্বাগ্রে জানতে পারবে।

— কিন্তু তুমি খাওয়া-দাওয়াটা করবে তো!

— ভালো কথা! একটু হাসলেন রয়েণ্টজেন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, এবার থেকে খাবার জন্যে আমি কিছু সময় রাখব।

কিন্তু যে উত্তেজনাপূর্ণ কর্মচঞ্চল মুহূর্তগুলো কাটতে লাগল তাতে তাঁর ঐ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হতে লাগল। সাধারণত শ্রীমতি বার্টার সঙ্গে খুব সকালে গবেষণাগার থেকে ফেরার সময়ই তাঁর একবার দেখা হয়। তারপর কয়েক ঘণ্টা নামমাত্র বিশ্রাম করে আবার ছুটে যান গবেষণাগারে। দিনভর ব্যস্ত থাকেন রুদ্ধদুয়ারে গবেষণাগারে। এখন সহকারীর কি ব্যবস্থাপকেরও গবেষণাগারে প্রবেশাধিকার নেই। মাঝে-মধ্যে শ্রীমতির সঙ্গে আহারে বসেন। শ্রীমতি নানাভাবে অনুনয় বিনয় করেন, নানা উৎসুকতাপূর্ণ প্রশ্ন তোলেন। রয়েণ্টজেন নিথর, নিস্পন্দ। একেবারেই নিরুত্তর। কোন প্রশ্নেরই জবাব দেন না তিনি।

রয়েন্টজেনের মন-প্রাণ এখন ঐ এক্স-রে'র ওপর। বহির্বিশ্বের নানা ঘটনা প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি অনড়-অচল। বহির্বিশ্বের সামনে তুলে ধরার আগে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় বার বার পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তাঁর ঐ রশ্মিকে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে চললেন।

তিনি আগেই জেনেছিলেন যে আলোকচিত্রের কাগজের ওপর ঐ রশ্মি কাজ করছে। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। ধীরে ধীরে ধৈর্য ও নিষ্ঠাসহকারে তিনি আরও অগ্রসর হলেন। এক্স-রে'র ধর্ম ও ভৌতিক স্বভাব তিনি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন, পর্যবেক্ষণ করলেন ওকে প্রতিসরিত করতে পারা যায় কি না। আরও দেখলেন, তড়িৎ কি চুম্বকের প্রভাবে ঐ রশ্মির বিক্ষেপণ ঘটে কি না। ধীরে ধীরে ছবিটা মূর্ত হতে লাগল। রয়েন্টজেন এই পরম উত্তেজনাপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে বায়ুশূন্য নলের তড়িৎ শক্তির প্রভাবেই নিঃসন্দেহে এই রশ্মির সৃষ্টি এবং তড়িতাহত পদার্থ কণিকার সমন্বয়ে এ রশ্মি সম্ভবত গঠিত নয়।

মধ্যে নতুন সমস্যা দেখা দিল। রয়েন্টজেন জানতেন, ভিন্ন ভিন্ন রশ্মির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা বিদ্যমান— অনেকটা চিত্রকরের পর পর সাজানো রঙের বিকিরণের মত— অদৃশ্য কোন রশ্মিতেই শেষ। এর মধ্যে, বর্ণালীর মাঝ বরাবর কোথাও দৃশ্যমান আলোকের সঙ্কীর্ণ এলাকা। রয়েন্টজেন স্থির সিদ্ধান্তে এলেন, তাঁর ঐ এক্স-রে'র দীর্ঘ বিকিরণ সারির মধ্যে কোথাও অবস্থান করছে, শুধু বুঝে উঠতে পারছেন না, ঠিক কোথায় ওর অবস্থান।

কিন্তু আরও অন্য কতকগুলো জিনিসও তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। তিনি প্রমাণ করে দেখালেন যে ঐ এক্স-রে স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হয় না, এক বিশেষ ধরনের নলে কৃত্রিম উপায়ে ওকে সৃষ্টি করতে হয়। যেমন ক্যাথড-রশ্মি ঐ বায়ুশূন্য নলের গায়ে আঘাত করে ওকে সৃষ্টি করেছিল। বস্তুত এক্স-রে সৃষ্টি হয়, যখন ক্যাথড-রশ্মি কঠিন বস্তুতে প্রতিহত হয়।

রয়েন্টজেন তাঁর প্রথম ছয় সপ্তাহের সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলো লিপিবদ্ধ করেন এক নিবন্ধে। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তিনি ওর নামকরণ করেন: নতুন ধরণের একপ্রকার বিকিরণের বিবরণী। কিন্তু ওর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবী বিস্ময়ে চমকে উঠল।

নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস এইভাবে কাটল। অবশেষে, বড়দিনের কিছু

আগে রয়েণ্টজেন স্থির করলেন, এবার তিনি অপরের পক্ষে দুর্ভেদ্য তাঁর দীর্ঘ দিনের এই নীরবতা ভঙ্গ করবেন, স্ত্রীকে জানাবেন এ-যাবৎ সন্দেহাতীত তাঁর এই আবিষ্কারের কথা।

বড়দিনের সন্ধ্যার দু'দিন আগে অধ্যাপক সেই সপ্তাহে প্রথম আবার মধ্যাহ্ন ভোজনে যোগ দিতে এলেন। বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল ওঁকে। বার্টাকে মধুর সম্ভাষণ করে ডাকলেন— আমার সঙ্গে গবেষণাগারে চলো, তোমার একটা ছবি তুলব।

বার্টা ভাবলেন, তিনি বোধহয় ভুল শুনছেন। কয়েক সপ্তাহ হলো, স্বামী তাঁকে এড়িয়ে চলেছেন। কেমন যেন নিজের ঘোরে আছেন। শান্ত, আত্মসমাহিত। আর আজ হঠাৎ বলছেন— চলো, তোমার একটা ছবি তুলব।

তিনি মাথা নাড়লেন। কিন্তু তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারলেন না। তাঁকে অনুসরণ করতে করতে গবেষণাগারে গিয়ে উঠলেন। তারপর স্বামীর অনুরোধে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন কালো কাগজে মোড়া কিছু যন্ত্রপাতি আর অদ্ভুত সবুজ আলোয় প্রতিদীপ্ত একটা পর্দার মধ্যে। অন্ধকারে ওর স্বামী যন্ত্রপাতি নিয়ে খুঁটি-নাটি কি সব করলেন। তারপর কাচের পাতটা নিয়ে কি করলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আলোটা জ্বালালেন এবং পরিস্ফুটিত ছবিটা তার সামনে ধরলেন দেখার জন্যে।

ভয়ে বার্টার শ্বাসরুদ্ধ হবার অবস্থা। কারণ ছবিতে ফুটে উঠেছে একটা হাতের কঙ্কাল— তাঁর নিজের হাতের কঙ্কাল।

অধ্যাপক স্ত্রীর অমন ভয় ব্যাকুল অবস্থা দেখে কিছুক্ষণ হাসতে লাগলেন। তারপর তিনি টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে ছবির প্লেটে স্মরণীয় দিনটাকে খোদাই করে রাখলেন : ডিসেম্বরর ২২, ১৮৯৫।

এক্স-রে'র নাটকীয় গল্পের পরবর্তী অধ্যায় রচিত হয় উর্জবুর্গে নয়, ভিয়েনায়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের একদিন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান সংস্থানের পরিচালক প্রফেসর ফ্রাঞ্জ এক্সনার শারীর বিদ্যা-সংস্থানের পরিচালক তাঁর ভাই সিগ্‌মণ্ডের ওখানে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লেন।

— আমি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পত্র পেয়েছি। তিনি আরম্ভ করলেন। আমার এক প্রাক্তন ছাত্র— উর্জবুর্গের অধ্যাপক উইলহেল্ম রয়েণ্টজেন আমাকে জানিয়েছে যে ক্যাথড-রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে সে এমন এক নতুন

ধরনের বিকিরণের সম্মুখীন হয়েছে, যা কালো কাগজ, কাঠ ও নানা ধাতু ভেদ করে চলে যায়। সাক্ষী হিসেবে এই ছবিগুলো না পেলে আমার বন্ধু রয়েণ্টজেনের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রতি যথেষ্ট আস্থা থাকা সত্বেও ওর এই গল্প আমি বিশ্বাস করতাম না।

ফ্রাঞ্জ এক্সনার ভায়ের টেবিলে এক গোছা ছবি রাখলেন— এই ছবিগুলো, তিনি বললেন, রয়েণ্টজেনের চিঠির সঙ্গে ছিল। এগুলো নিশ্চয়ই প্রমাণ করছে, যে, সে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক আবিষ্কার করে বসেছে। চিঠিতে রয়েণ্টজেন আমাকে পরীক্ষাগুলো খুঁটিয়ে দেখতে বলেছে। বিস্তারিত ব্যাবস্থাদিও সে ওগুলোর সঙ্গে পাঠিয়েছে। আমি আমার সহকারী ডঃ হাসচেককে রয়েণ্টজেনের বিচারগুলো খতিয়ে দেখার জন্যে পরামর্শ দিয়েছি। ওর ঐ কাজের সময় তুমি কি ওখানে উপস্থিত থাকতে পারবে?

সিগমণ্ড এক্সনার আনন্দে ঐ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

আর একবার ছবির তাড়াটা তুলে নিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন ফ্রাঞ্জ এক্সনার।— সরাসরি তোমার কাছে আসায় সম্ভবত তুমি একটু অবাক হয়ে গেছ। আমার মনে হয়েছে, এ-ব্যাপারটা চিকিৎসাবিদ্‌দের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণরূপে দেখা দেবে।

এক্সনারের সহকারীর মনেও অনুরূপ ভাবনাই দেখা দিয়ে থাকবে। কারণ কয়েক দিন পরে এক্সনারের ভায়ের সামনে রয়েণ্টজেনের পরীক্ষাগুলো করার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসালয়ের শল্য চিকিৎসক তাঁর বন্ধু শারীর বিশেষজ্ঞ ডঃ গুষ্টাভ কাইজারকেও তিনি আমন্ত্রণ করেছিলেন।

অষ্ট্রিয়ার বিজ্ঞানীরা হাস্‌চেকের নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ ও পরীক্ষাগুলো লক্ষ্য করছিলেন। পরীক্ষার ফলাফল রয়েণ্টজেনের সিদ্ধান্তগুলোর সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে দেখে বিস্ময়ে ও গভীর উত্তেজনায় হতবাক হয়ে গেলেন। সর্বভেদী এই রশ্মির খবর এবার গিয়ে পৌঁছল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসালয়ের অধিকর্তা নিউসারের কানে। ডঃ কাইজার ওখানে কাজ করছিলেন। অধিকর্তা তৎক্ষণাৎ কাইজারকে আর কিছু দূরে সরিয়ে রেখে ঐ নতুন রশ্মি নিয়ে কাজ করতে নির্দেশ দিলেন।

গুষ্টাভ কাইজার খুব আনন্দিত হলেন। ঐ রশ্মির সঙ্গে প্রথম পরিচিত হবার পর থেকেই ঐ রহস্যময় এক্স-রে সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

এই নতুন রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা চালানোর জন্যে ব্যাকুল হয়ে তিনি একটি সন্ধ্যা টার্কেনত্রাসের ভৌতিক পরীক্ষাগারটি ব্যবহারের জন্য ডঃ হাসচেকের অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

— কিন্তু শারীরবিদ্ হয়ে ভৌতিক বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য আপনি এত আগ্রহী কেন?— হাসচেক প্রশ্ন করলেন।

— আপনি বুঝতে পারবেন। রহস্যপূর্ণ উত্তর এল কাইজারের কাছ থেকে।

এইভাবে জার্মান পদার্থবিদ্ প্রথম যে বিস্ময় দিয়ে পৃথিবীকে চমকে দিয়েছিলেন, অস্ট্রিয়ার একজন তরুণ ডাক্তারের হাতে দ্বিতীয়বার তা আবার সৃষ্টি হলো।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর। অস্ট্রিয়ার সুনির্বাচিত একদল পদার্থবিদ্ ও চিকিৎসাবিদ্ টার্কেনত্রাসের ভৌতিক পরীক্ষাগারে সমবেত হলেন। পরীক্ষাগারের ব্যবস্থাপকের প্রতি নির্দেশ ছিল কেউ যেন তাঁদের বিরক্ত না করে। বস্তুত বিশেষ গোপনীয়তার মধ্যে রুদ্ধ-দুয়ার কক্ষে সমস্ত প্রস্তুতি চলল। হাবে-ভাবে মনে হলো, বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের নিয়ে নয়, এ যেন ষড়যন্ত্রকারীদের এক সভা। সর্বপ্রথম পদার্থবিদ্ হাসচেক পুরনো যন্ত্রপাতিগুলো এনে জড়ো করলেন। যন্ত্রপাতিগুলো উর্জবুর্গ থেকে রয়েন্টজেনের প্রেরিত নির্দেশ অনুসারে তাঁরই তৈরি। সর্বাঙ্গসুন্দর না হলেও, ইহাই অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের প্রথম এক্স-রে ক্যামেরা। যখন এর সমস্ত উপকরণ সম্পূর্ণ হয়ে উঠল, তখন হাসচেক শারীরবিদের হাতে ওটা তুলে দিলেন।

এবার ঐ এক্স-রে'র প্রদর্শনের পরিকল্পনা। ঐ পরিকল্পনা করতে করতে ডঃ কাইজার একটি বিনিদ্র রাত কাটিয়ে দিলেন। সেই দিনে, সেই যুগে ঐ পরিকল্পনা ছিল এতই অদ্ভুত যে, ডঃ কাইজার নিজের দুঃসাহসিকতায় নিজেই ভয় পেয়ে গেলেন। উপস্থিত কেউই তাঁর ঐ পরিকল্পনার কিছুই আঁচ করতে পারলেন না। সর্বপ্রথম তিনি বন্ধু হাসচেকের তৈরি এক্স-রে ক্যামেরাটা ঠিকমত কাজ করছে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইলেন।

এই জন্যে তিনি পেতলের দুটো ভারী বাট নিয়ে এলেন। কাঠের বাক্সে ঐ দুটো রেখে তিনি ক্যাথড-রে নল থেকে নির্গত এক্স-রে সামনে ধরলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, ঐ ক্যামেরা কাজ করছে। কাঠের

বাক্সের ভিতর দিয়ে এক্স-রশ্মিগুলো নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেল এবং ছবির কাগজে পেতলের বাটগুলোর ছায়া-ছবিগুলো নিখুঁতভাবে ফুটে উঠল। কারণ যে রশ্মিগুলো ঐ পেতলের বাটগুলোর ওপর পতিত হয়েছিল, সেগুলো অনেকখানি শক্তিই হারিয়ে ফেলেছিল।

ডঃ কাইজার এবার পরীক্ষাগারের ব্যবস্থাপকের কানে কানে কি বললেন, ব্যবস্থাপক বাইরে বেরিয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। সমবেত সঙ্গীরা বুঝে উঠতে পারলেন না, রশ্মি নিয়ে পরীক্ষায় রত বিজ্ঞানীদের সভায় এই বাচ্চা কি করবে। কিন্তু ডঃ কাইজার ইতিমধ্যেই বোঝাতে শুরু করেছিলেন। তিনি বললেন— ভদ্রমহোদয়গণ, একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। আমাদের শল্য চিকিৎসা বিভাগের এক সহকর্মী এই বাচ্চা মেয়েটাকে আমার কাছে দিয়ে গেছেন। একদিন, আমার স্থির বিশ্বাস, এই শিশু ভাববে, যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি তার ঐ পায়ের পাতা লাভ করল তার তুলনায় তার আজকের অসুবিধাগুলো নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অসুবিধার কারণ এই যে, আমি বেশ কিছু সময় ধরে ওর পা-টাকে এক্স-রে'র চৌহদ্দির মধ্যে রাখতে বলব।

— কি উদ্দেশ্য? আপনারা হয়ত প্রশ্ন করবেন।

— জন্ম থেকে মেয়েটির পায়ের পাতার হাড় জোড়া। আমার আশা, এই ধরনের বিকৃত হাড়ের ছবি হয়তো এই ক্যামেরায় তোলা সম্ভব হবে।

বাতি নিভিয়ে দিয়ে এক্স-রে চালু করা হলো। ঐ সময় রেডিওগ্রাফির কলাকৌশল পুরা আয়ত্ত করা যায় নি, এক্স-রে'র কিরণও ছিল অনেক কম শক্তিসম্পন্ন। সেই কারণে পৃথিবীর সর্বপ্রথম এক্স-রে তুলতে সময় লেগেছিল প্রায় এক ঘণ্টার ওপর—এবং ঐ দীর্ঘ সময় বাচ্চা ঐ রোগীটিকে তার পায়ের পাতাটিকে বিকিরণ ক্ষেত্রে রাখতে হয়েছিল।

অবশেষে পরীক্ষা শেষ হলো, বাচ্চা মেয়েটিকে মুক্তি দেওয়া হলো। কয়েক মিনিট ধরে যখন ছবিটির পরিস্ফুটন করা হচ্ছিল, তখন সঙ্গীদের মধ্যে সে কী উত্তেজনা! তারপর ছবিটি হয়ে গেলে বিজ্ঞানীদের মস্তক সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ল ছবিটির ওপর। জোড়াপাতার ছবিটি পুরোপুরি উঠছে। ভিয়েনা থেকে ঐ ফটো সারা দুনিয়া ঘুরে এল।

ডঃ কাইজারের নিজের এই 'কেস'টার ওপর এবার পুরো বিশ্বাস জন্মাল।

কিন্তু পরবর্তী নাটকীয় প্রদর্শন শুরু করার আগে তিনি সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে তাঁর মনের ইচ্ছেটা জানালেন।

— শুধুমাত্র জড়পদার্থের এক্স-রে ছবি তুলে আমাদের কি কাজ হবে? যতই চাঞ্চল্যকর হোক, ওগুলো বিশেষ করে আমাদের মত ডাক্তারদের কোন্ কাজে আসবে? আমি এই এক্স-রে সজীব প্রাণীর মধ্যে দিয়েও প্রেরণ করতে চাই, যাতে আমাদের চোখের ও অনুসন্ধিৎসু আঙুলের অন্তরালে লুক্কায়িত রহস্যগুলোও উদ্‌ঘাটিত হয়। ভদ্রোমহোদয়গণ, আমাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন? এই নতুন রশ্মির সাহায্যে আমরা কেন মানবদেহের অন্তঃপুরটা ভালভাবে খতিয়ে দেখব না? এতদিন পর্যন্ত মৃত্যুর পর কাঁটা-ছেঁড়ার টেবিলে না আসা পর্যন্ত মানবদেহের ভেতরটা দেখার আমাদের কোন সুযোগই ছিল না। কিন্তু এখন? আর একবার ঐ জোড়া পায়ের পাতাটার দিকে তাকান। শল্যচিকিৎসককে তাঁর করণীয় সব কিছুই কি ও জানিয়ে দিচ্ছে না? ভবিষ্যতে এবার থেকে আমাদের কাজ হবে স্বাভাবিক কঙ্কালের সঙ্গে বিকৃত কঙ্কালের ছবি তুলনা করে দেখা। তা হলেই বিকৃত কঙ্কালের ক্ষেত্রে প্রকৃতি কোথায় ভুল করেছে আমরা জানতে পারব এবং ঐ দোষগুলো দূর করার জন্য অগ্রসর হতে পারব। এখন আমরা আর এক ধাপ এগিয়ে যাই। জটিল হাড় ভাঙার একটা নিখুঁত ছবি উদ্ধারের জন্য আমরা এই এক্স-রে' ব্যবহার করি।

ব্যবস্থাপক আর একটি ছোট মেয়ে নিয়ে এল— এও শল্য চিকিৎসা বিভাগের একজন রোগী। এই বাচ্চা মেয়েটি, ডাঃ কাইজার বোঝাতে লাগলেন—কিছুদিন আগে ওর বাহুর হাড় ভেঙেছে। ভাঙাটা জোড়া লাগান হয়, কিন্তু ভালভাবে জোড়ে নি। এর কারণ বোধ হয়, আমরা নিশ্চিতরূপে জানি না, হাড়গুলো কি ভাবে আছে। আমাদের শল্য-চিকিৎসকরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। বাইরে থেকে দেখে তাঁরা কিছুই ধরতে পারলেন না। আমরা এবার তাঁদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব।

ডঃ কাইজার যখন মেয়েটির ভগ্ন বাহুর ওপর এক্স-রে ফেললেন, তখন ছোট পরীক্ষাগারে একটা 'কি হয়, কি হয়' ভাব। আবার একঘণ্টা অতিবাহিত হলো। কিন্তু বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই এই পরীক্ষার বিশেষ গুরুত্ব সম্বন্ধে এত নিশ্চিন্ত ছিলেন যে তাঁরা অসীম নীরবতার মধ্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

তাঁরা নিরাশ হন নি। যখন বাহুর ছবির কাচের প্লেটটা উপস্থিত চিকিৎসাবিদ্‌-দের হাতে দেওয়া হলো, তখন তাঁরা বেশ বুঝতে পারলেন হাড়গুলি কোথায় ত্রুটিপূর্ণভাবে সংযোজিত হয়েছে এবং মেয়েটির হাড়গুলো ঠিক জায়গায় বসানোর জন্যে কি করতে হবে। এইভাবে অষ্ট্রিয়ার তরুণ, একজন জার্মান পদার্থবিদ্‌ কর্তৃক আবিষ্কৃত 'এক্স-রে'কে এক নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখালেন। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগেই চিকিৎসাক্ষেত্রের এক্স-রে পরীক্ষা সর্বপ্রথম সম্পাদিত হয়।

দেখতে দেখতে রয়েণ্টজেন ও তাঁব যাত্রুরশ্মির খবর চিকিৎসা অনুসন্ধান প্রয়োগশালা ডিঙিয়ে দাবানলের মত জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

ভিয়েনার প্রখ্যাত দৈনিক 'দি নিউ ফ্রাইয় প্রেস' একদিন সকালে ছাপল: সর্বভেদীরশ্মি এখন মানুষের আয়ত্তে। যত সংগোপনেই রক্ষিত হোক না কেন, মানবদেহের কোন গুপ্ত রহস্যই এই রশ্মির সন্ধানী দৃষ্টি ফাঁকি দিতে পারবে না। এই চাঞ্চল্যকর খবর অন্যান্য দেশের কাগজগুলো সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিল, এর সম্বন্ধে আরও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিস্তারিত ভাবে লিখল। শীঘ্রই এর যাত্রুরশ্মি মানুষের মুখে মুখে প্রধান খবর হয়ে দাঁড়াল। সাধারণ লোকের ক্যাথড রশ্মি বা প্রতিদীপ্ত পর্দা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই ছিল না। তারা নিজেদের মত করে ঐ চাঞ্চল্যকর রিপোর্টের ব্যাখ্যা করতে লাগল। সমস্ত ব্যাপারটাই ওদের কাছে অস্বাভাবিক ও ভীতিপ্রদ বলে মনে হলো। কাগজ পড়ে তারা কি করে বুঝবে যে উর্জবুর্গের এক বিজ্ঞানী কি এক নলের সাহায্যে সব কিছুর ভেতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করার ব্যাপারে সফলকাম হয়েছেন। কি করে বুঝবে যে, এই এক্স-রে চক্ষু যা ব্যক্তির পোষাকের ভেতর দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে, মানবদেহের চামড়ার ভেতরে প্রবেশ করতে পারে, তার থেকে কোন কিছুই মুক্ত নয়।

হাস্যকৌতুকের কাগজগুলোর পক্ষে এটা ছিল খুবই ভালো সময়। তাঁরা এক্স-রে চশমা ও এক্স-রে দূরবীনের ছবি ছাপাল এবং তাঁদের পাঠকবর্গকে বিজ্ঞানের এই সর্বশেষ উপকরণে সজ্জিত মানুষগুলো থেকে সাবধান করে দিল। —হুঁশিয়ার। ওরা রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াবে, দেওয়ালের ভেতর দিয়ে উঁকি দেবে, প্রতিবেশী নাগরিকদের ব্যক্তিগত জীবনের গোপন রহস্যের গুপ্তচরবৃত্তি করবে।

আটলান্টিকের উভয় পারের দায়িত্বশীল ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এই সর্বভেদী এক্স-রে'র কুসংস্কারে ভীত হয়ে উঠল। বেশি কথা কি, আমেরিকার কংগ্রেসের যোগ্যতম ব্যক্তিরা পর্যন্ত এই সর্বব্যাপী আতঙ্কের শিকার হলো। বিধান সভার একজন সদস্য তো বেশ গাম্ভীর্যের সঙ্গে সারা আমেরিকা রাজ্যে ঐ রশ্মির ব্যবহার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে একটি বিল উত্থাপন করে বসলেন।—কি কারণে—তিনি প্রতিবাদ করলেন, এই নীতিহীন রশ্মিগুলোকে যার কাছে কিছুই পবিত্র বা পরিলক্ষিত বলে থকেতে পারে না. মানুষের ওপর নগ্নভাবে নৃত্য করতে দেওয়া হবে? আমেরিকার ব্যবসায়ীরা তাঁদের ক্রেতাদের এই আতঙ্ক থেকে অর্থলাভ করতে ছাড়ল না। বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপন বেরুল: মেয়েদের জন্যে এক্স-রে প্রুফ্ কাপড় আর পুরুষদের জন্যে এক্স-রে প্রুফ্ পকেট ডায়েরী। বোঝান হলো, কত ডলার পকেটে আছে এই পকেট-বুকগুলো, এক্স-রে চশমা-ধারীদের জানতে দেবে না।

রয়েণ্টজেনের যাদুরশ্মির রক্ত-হিম করা এই ধরনের চাঞ্চল্যকর খবর সম্বলিত একটা আমেরিকার সংবাদপত্র দৈবক্রমে ভিয়েনার ডাঃ লিওপোল্ড ফ্রায়েণ্ডের হাতে এসে পড়ল। স্বভাবতই, বিজ্ঞানী হিসেবে ঐ চাঞ্চল্যকর শিরোনামার বা এক্স-রে সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণাসম্পন্ন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঐ লেখার প্রতি তিনি তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। কিন্তু এককোণের একটা ছোট্ট বিজ্ঞপ্তির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে আমেরিকার জনৈক ইঞ্জিনিয়ার নিজের গৃহে তৈরি এক্স-রে উপকরণ দিয়ে এক্স-রে ফটো তুলতে তুলতে লক্ষ্য করেন যে তাঁর চুল উঠে যাচ্ছে।

হাজার হাজার লোক ঐ বিজ্ঞপ্তিটা পড়ে থাকবে, কিন্তু কেবল একজনের মনেই ওটা একটা নতুন চিন্তার সূচনা করল। ডঃ ফ্রায়েণ্ড জানতেন যে, রাষ্ট্রীয় মুদ্রণ অনুসন্ধান সংস্থার মান্ধাতা আমলের একটা এক্স-রে উপকরণ আছে। তিনি কয়েকটি পরীক্ষার ব্যাপারে ওটা ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে আবেদন করলেন।

এক্স-রে যদি ন্যু ইয়র্ক ইঞ্জিনিয়ারের চুল ওঠার কারণ হয়, তিনি যুক্তি দেখালেন, তাহলে এক্স-রে'র এই অস্বাভাবিক প্রকৃতিকে কতকগুলো রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। চিকিৎসালয়ের বহির্বিভাগের দশ বছরের একটি মেয়ের কথা তাঁর মনে পড়ল। মেয়েটি দীর্ঘদিন ধরে তাঁর পৃষ্ঠদেশের

একটি স্থানের চুলের চিকিৎসা করাচ্ছিল। জন্মলগ্ন থেকেই ওখানে অমন চুলের বিন্যাস দেখা গিয়েছিল।

— আমি তোমার ঐ কলঙ্কটা মুছে দেব। ছোট মেয়েটিকে উনি বললেন। শিশু ও তাঁর মা সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়েছিল। ওঁর ও-কথায় ওঁরা তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে রাজী হয়ে গেলেন। এইভাবে এই সর্বপ্রথম এক্স-রে শুধু পরীক্ষার জন্য নয়, রোগের চিকিৎসার জন্যও ব্যবহৃত হলো।

মেয়েটি এক্স-রে উপকরণের সামনে গিয়ে বসল এবং ঐ রহস্যপূর্ণ রশ্মিগুলো পৃষ্ঠদেশের চুলের ঘন বিন্যাসের ওপর গিয়ে পড়ল। ঐ ঘন বিন্যস্ত চুল এতদিন পর্যন্ত সমস্ত চিকিৎসাই প্রতিরোধ করে একইভাবে ছিল।

শীঘ্রই ডাঃ ফ্রয়গু ভিয়েনার চিকিৎসা সমাজকে সুদূর প্রসারী এক আবিষ্কারেব সংবাদ দিতে সক্ষম হলেন। এক্স-রে'র প্রভাবে উনি চুলের উৎপত্তি দূব করতে সক্ষম হলেন। এক্স-রে চিকিৎসার জন্ম হলো এইভাবে।

কয়েক সপ্তাহ বাদে ঐ মেয়েটি আবার ওঁর চিকিৎসালয়ে ফিরে এল। গভীর হতাশায় তার মা ডাক্তারদের তার পিঠটা একবার দেখতে বললেন। চিকিৎসকরা আবার নতুন এক সমস্যায় পড়লেন। এ-কথা ঠিক যে, পিঠের ঐ জায়গায় চুল আর গজায় নি, কিন্তু মেয়েটির পিঠের যে অংশটুকু এক্স-রে বিকিরণের সম্মুখে ছিল সেই সমস্ত অংশই বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়েছে। ওখানকার মাংসপেশীর টিস্যুগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, মরে গেছে। টিস্যুর অতিগলন-জনিত রোগে মেয়েটি ভুগছে। চর্মরোগের চিকিৎসালয় থেকে শল্য চিকিৎসালয়ে ওকে এখনই স্থানান্তরিত করা দরকার, আরো যন্ত্রণাদায়ক ও দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার জন্যে।

চিকিৎসা-জগতের আনন্দোল্লাস যেন নিমেষে ফুরিয়ে গেল। এ যে এক ভয়ঙ্কর আবিষ্কার। এই নতুন রশ্মি শুধু রোগ নিরাময়ই করে না, মানুষের ক্ষতিও করে। এমন কি সম্ভবত মানুষকে মেরে ফেলতে পারে।

রয়েন্টজেন কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর গবেষণাগারে ফিরে গেছেন, তাঁব এই রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাও চালাচ্ছেন অনেক। তাঁর প্রথম প্রবন্ধের আরও বিস্তারিত আকারে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলো। ওতে তাঁর পরীক্ষার আরও অনেক ফলাফল লিপিবদ্ধ হলো।

দিনের পর দিন তাঁর টেবিলে দেশ-দেশান্তর থেকে আসা চিঠির পাহাড়

জমে উঠল— বিস্ময়, জিজ্ঞাসা, অভিনন্দন। এক বছরের মধ্যেই ঐ চিঠির পাহাড় থেকে রয়েণ্টজেন বেশ বুঝতে পারলেন যে তিনি ইতিমধ্যেই বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত হতে তাঁর তখনও বাকি। পদবীর আভিজাত্য তিনি অর্জন করেছিলেন বটে, কিন্তু আগের মতই তাঁকে সকল ব্যাপারে সই-সাবুদ করতে হতো। তাঁর জন্মস্থান লেনেপ এবং অন্যান্য জার্মান শহরে তিনি স্বাধীন স্বচ্ছন্দভাবে থাকতে পারতেন, কিন্তু ঐ সমস্ত ডিপ্লোমা ও সম্মান ড্রয়ারে বন্ধ অবস্থায় পড়েছিল। পদক ও নির্দেশ সারা পৃথিবী থেকে একের পর এক বাড়িতে আসতে শুরু করেছিল, শ্রীমতী বার্টারের কাপড়ের আলমারিতে সকলের দৃষ্টির অলক্ষ্যে সেগুলো বন্দী হয়ে পড়েছিল। তাঁর সম্মানে উর্জবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা আয়োজিত মশাল শোভাযাত্রা দেখেই তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেই আগের মানুষটিই রয়ে গেলেন—বিনয়ী, ধীর, স্থির—খ্যাতি, প্রশংসায় ও শ্রদ্ধায় নির্বিকার। তাঁর একমাত্র প্রার্থনা: বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য আরও সময়, আরও অবসর।

রয়েণ্টজেনের যুগান্তকারী আবিষ্কারের পর এক বছরের ওপর পার হয়ে গেল। ডিসেম্বরের সন্ধ্যা। আর একবার রয়েণ্টজেন বাড়িতে ফিরছেন। স্ত্রীর সঙ্গে বাস করছেন। শ্রীমতি বার্টা কাগজ পড়ছিলেন। সহসা বিস্ময়াকুল কণ্ঠে শ্রীমতী বার্টা উচ্চারণ করলেন—উইলহেল্ম, জানো তো ক'দিন হলো আলফ্রেড নোবেল সান রেমোয় পরলোকগমন করেছেন!

রয়েণ্টজেন জানতেন না। তিনি এই সংবাদে বিশেষ বিচলিতও হলেন না! নোবেলের সঙ্গে ব্যক্তিগত তাঁর কোন পরিচয় ছিল না। সাধারণ মানুষ নোবেলের সম্বন্ধে যতটুকু জানতেন, তিনিও ঠিক ততটুকুই জানতেন। সুইডেনের ঐ রসায়নবিদ্ বিস্ফোরক পদার্থের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আধুনিক তপস্বী সুলভ তাঁর মনোভাব। অদ্ভুত বিপরীত চরিত্রের মানুষ ছিলেন তিনি। সর্বদা ভালো কিছু করতে চাইতেন, কিন্তু হয়ে পড়ত খারাপ। তিনি ছিলেন একজন লোক হিতৈষী, এক গোঁড়া আদর্শবাদী। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব-শান্তিই ছিল তাঁর বাণী। অথচ মারাত্মক বিস্ফোরক দ্রব্যের এবং সর্বোপরি ডিনামাইটের আবিষ্কারক হিসেবে তাঁর কাজ বিপরীত ফল প্রসব করল। সেই সময়কার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বিস্ফোরক নাইট্রোগ্লিসারিনের উদ্ভাবন করে শান্তির দূত

আলফ্রেড নোবেল পরিণামে যুদ্ধবাজ নেতৃবৃন্দের হাতে পৃথিবীকে আতঙ্কের মধ্যে রাখার উপযোগী ধ্বংসাত্মক সমর হাতিয়ারই যুগিয়েছিলেন।

— এই শোনো না, এখানে কি লিখেছে, শ্রীমতী বার্টা বললেন। আলফ্রেড নোবেল তাঁর জীবদ্দশায় কমপক্ষে ৩৫৫টি পেটেণ্ট নিয়েছিলেন। এদের অধিকাংশই বারুদ ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্যের ওপর। কিন্তু নোবেল তিন কোটি সুইশদেশীয় মুদ্রার (ক্রাউন) একটা উইল রেখে যান। ঐ ফাণ্ডের সুদ বাবদ সঞ্চিত অর্থ থেকে প্রতি বৎসর ১০ই ডিসেম্বর, তাঁর মৃত্যু-বার্ষিকীতে পাঁচজনকে পুরস্কৃত করা হবে, যে পাঁচজন বিগত বৎসরে মানব কল্যাণে সবচেয়ে বেশী কাজ করে গেছেন। তাঁরই নির্দেশমত ঐ নোবেল পুরস্কার প্রতি-বৎসর একজন পদার্থবিদ্, একজন রসায়নবিদ্, একজন চিকিৎসাবিদ্ ও একজন কবিকে দেওয়া হবে। সর্বশেষে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগানোর উদ্দেশ্যে নিয়মিত সৈন্যবাহিনী অপসারণের উদ্দেশ্যে যিনি সবচেয়ে বেশী কাজ করবেন, জাতি নির্বিশেষে সেই ব্যক্তিকেও একটি বিশেষ নোবেল পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে। কী রকম অদ্ভুত কথা! সারাজীবন ধরে যিনি বিনাশ আর সংহারের কাজ করে গেলেন, তিনিই ঐ মারণাস্ত্র ডিনামাইট থেকে উপার্জিত কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে গেলেন শান্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে।

— সম্ভবত, চিন্তামগ্নভাবে রয়েণ্টজেন বললেন, নোবেলের বিপরীত চরিত্রের মধ্যেই এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে। নোবল উপলব্ধি করেছিলেন যে শান্তির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হলেও তাঁর নিজের কাজ ভবিষ্যতে যুদ্ধকেই আরও ভয়ঙ্কর করে তুলবে। আমি বেশ কল্পনা করতে পারি, শান্তির উদ্দেশ্যে সমস্ত অর্থ গচ্ছিত রেখে নোবেল এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিলেন। বার্টা, তুমি কি বুঝতে পার না, মানুষের জীবনকে সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তোলার জন্য আমাদের মত বিজ্ঞানীদের প্রতিটি আবিষ্কার বিপদ ও সংহারের অশুভ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহজেই ব্যবহৃত হতে পারে? যদি কোন ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার ফলে বা এই এক্স-রে'র অপপ্রয়োগের ফলে কোথাও কোনদিন কোন মনুষ্যজীবন নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বার্টা, তুমি কি আমায় হত্যাকারী হিসেবে সনাক্ত করবে?

— ভগবান রক্ষা করুন! বার্টা উচ্চারণ করলেন।

— তা হলেই বুঝতে পারছ। আমরা হয়তো নোবেলের প্রতি অবিচার করছি। সম্ভবত নোবেল বিশ্বাস করেছিলেন ডিনামাইটের সংহারক মূর্তি দেখে ভবিষ্যতে যুদ্ধের ভয়াবহতা বিবদমান-রাষ্ট্রগুলোকে 'কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি' থেকে বিরত করবে। কিন্তু তাঁর ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। সেইজন্য তাঁর ঐ মারাত্মক ভুলের প্রায়শ্চিত্তের জন্য, শাস্তির জন্যে তিনি দিয়ে গেলেন কোটি কোটি টাকা······।

কয়েকটি মুহূর্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে কেটে গেল।

— তুমি কি জানো, শ্রীমতী বার্টা আবার মুখ খুললেন, কাদের জন্যে এই পুরস্কার? এখানে বলেছে, যাঁরা মানব কল্যাণে কাজ করে গেলেন তাঁদের জন্যে। তুমি কি তাঁদের মধ্যে একজন নও? তুমি কি আমায় বলো নি, তোমার ঐ রশ্মি সব জায়গায় কেমন ব্যবহৃত হচ্ছে? বিশেষত অষ্ট্রিয়ায় রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের জন্যে? তুমি কি মানবকল্যাণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ নও?

— যত বাজে কথা। রয়েণ্টজেন উত্তর দিলেন। আমি পদার্থবিদ্, চিকিৎসাবিদ্ তো নই।

— সম্ভবত, শ্রীমতী বার্টা বাধা দিয়ে বললেন, বিচারকরা তাঁদের ব্যাখ্যায় অত সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের পরিচয় দেবেন না।

কয়েক মুহূর্ত নিজের চিন্তাতেই ডুবে রইলেন বার্টা। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করে উঠলেন, অতো টাকা নিয়ে আমরা কি করব?

কিন্তু রয়েণ্টজেন তামাসার খাতিরেও এ ভবিষ্যৎবাণী শুনতে রাজী নন। বেশ ক্রুদ্ধভাবেই তিনি স্ত্রীকে বললেন, অমন বোকার মত কথা বলো না।

বার্টাকে কিন্তু অত সহজে চুপ করানো গেল না। বিশ্বখ্যাতি থেকে লাভবান হবার ব্যাপারে স্বামীর নিরুৎসাহ দেখে তাঁর খুব ক্ষোভ ছিল।

— তুমি নিস্পৃহ, নিরাসক্ত হতে পার উইলহেল্ম, অনুরাগভরে স্বামীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করলেন বার্টা।—তুমি তো ভালোভাবেই জানো, খ্যাতির প্রতি, অর্থের প্রতি আমার কোন মোহ নেই। কিন্তু বিজ্ঞানীর স্ত্রী হওয়ার অনেক অসুবিধাই আমাকে ভোগ করতে হয়েছে। তোমার প্রয়োগশালার চেয়েও অনেক কম অধিকার ছিল আমার, তোমার ওপর অন্তত কিছু সুবিধে এখন আমায় ভোগ করতে দাও। এটাও তোমার কাছে খুব অন্যায় বলে মনে হচ্ছে? তোমার মনে আছে, ওরা তোমায় পেটেণ্ট দিতে

চেয়েছিল, ঐ রশ্মির জন্যে প্রচুর টাকা দিতে চেয়েছিল ? কিন্তু তাচ্ছিল্যভরে তুমি তা উপেক্ষা করেছ। কেন, তোমার নামানুসারে ঐ রশ্মির নামকরণ করতে তুমি ওঁদের বাধা দিলে ? রয়েন্টজেন রশ্মি ? কী চমৎকারই না হতো নামটা ? আমায় ঐটুকু বিজয়গর্বে গরবিনী হতেও তুমি দিলে না !

— কিন্তু ঐ রশ্মিরাজি তো এখন আর আমার নয়। রয়েন্টজেন সবিনয়ে জানালেন। আজ ওরা সারা পৃথিবীর। আর তাছাড়া রাষ্ট্রের বেতনভুক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে, রাষ্ট্রের যন্ত্রপাতি ও উপকরণের সাহায্যে বাস্তবায়িত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে কি করে লাভবান হতে পারি ? আমাদের কথা যদি ধর বার্টা, আমরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রার্থিত সবই পেয়েছি। বৃদ্ধ বয়সে একটা পেনসনও পাব। সুস্বাস্থ্য, আমার কাজের সুযোগ ও অবসর আর পরস্পরকে ছাড়া আমরা আর কি চাই ?

১৯৫৪ সালের গ্রীষ্মকালে ইন্সব্রাকের অনতিদূরে ইন উপত্যকার সোলবাদ কক্ষে একজন অস্ট্রিয়ার সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। ভিয়েনার কাজ শেষ করে তিনি ছুটি ভোগ করছিলেন। পরের কয়েক সপ্তাহ তিনি পত্রিকা সংক্রান্ত সব কিছুই ভুলে থাকতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

প্রাচীন লবণ শহরের পাশ দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে বেড়াচ্ছিলেন। সুন্দর প্রাচীন অট্টালিকার সারি তাঁর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। সহসা তাঁর সাংবাদিক-সুলভ মনটা সচকিত হয়ে উঠল। একজন বৃদ্ধ একটু ঝুঁকে হাঁটতে হাঁটতে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। যে সম্মান, যে শ্রদ্ধা প্রতিটি পথচারী ঐ মানুষটিকে জানাচ্ছিল তার মধ্যেই অস্বাভাবিকতা খুঁজে পেয়েছিলেন এই সাংবাদিক। আর তৎক্ষণাৎ আর একটি জিনিসও সাংবাদিকের অভিজ্ঞ চোখ দু'টি আকৃষ্ট করল, মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওদের অভিবাদন জানাচ্ছিলেন কিন্তু কখনো মাথার টুপিটা তুলছিলেন না। আর একটা কথা, জুলাই মাসের ঐ দারুণ দহনেও ভদ্রলোকের দু'হাতে চামড়ার দস্তানা।

ঠিক সেই সময় বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটা কাফের দিকে ফিরলেন।

— সুপ্রভাত মহাশয়, আমার শুভেচ্ছা জানাই, সবিনয়ে ওকে অভিবাদন জানাল কাফের পরিচারক।

মানুষটি একটি ছোট টেবিলে গিয়ে বসলেন। সাংবাদিকটি ওঁকে

অনুসরণ করল। কাফেতে ঢুকে ও গিয়ে বসল ঠিক ও'র পাশের টেবিলে। তাঁর সাংবাদিক মন তাকে জানাচ্ছিল, একটা বিশেষ গল্প অপেক্ষা করে আছে।

ভদ্রলোক ঠিকই ধরেছিলেন। কারণ তিনি লক্ষ্য করলেন, পরিচারক এসে তাঁর টুপিটা মাথা থেকে তৎক্ষণাৎ খুলে নিল এবং যখন ভদ্রলোককে কালো কফি পরিবেশন করা হলো, তখনও ভদ্রলোক ঠোঁটের গোড়ায় কাপটি না তুলে, হাত ব্যবহার না করে সামনে ঝুঁকে মাথা নীচু করে কফি পান করতে লাগলেন।

সাংবাদিক বুঝলেন, বৃদ্ধ ভদ্রলোকের হাত দু'টি অকেজো। এইজন্যেই বোধ হয় হাতে চামড়ার দস্তানা।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক নিশ্চয়ই এই সাংবাদিকের সহৃদয় দৃষ্টিটা লক্ষ্য করে থাকবেন।

— আপনি নিশ্চয়ই এখানে নতুন। তিনি সাংবাদিককে বললেন। আপনি তাই বোধ হয় আমায় চিনতে পারছেন না। অন্য কোন কাজ না থাকলে আমার এই টেবিলে এসে বসতে পারেন। প্রথমেই আমি নিজেকে পরিচিত করিয়ে দিই, আমি ডঃ গুষ্টাভ কাইজার।

নামটি তরুণ সাংবাদিকের কাছে তেমন কোন গুরুত্ব নিয়ে দেখা দিল বলে মনে হলো না। কিন্তু তাতে ডঃ কাইজার কিছু মনে করছেন বলেও মনে হলো না। একটু হেসে তিনি বললেন, ভিয়েনার লোকে আমাকে বহু দিন হলো ভুলে গেছে। কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ যে, মৃত্যুর পর ওরা আমাকে মনে রাখবে। তখন, আমার তরুণ বন্ধুটি, তুমি আমার মৃত্যুসংবাদে হয়তো পড়বে যে, আমি সর্বপ্রথম চিকিৎসা বিষয়ে এক্স-রে ছবি তুলি। হ্যাঁ, আমি রয়েণ্টজেনকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম এবং আমিই ভিয়েনায় বহু বছর আগে ঐ এক্স-রে'র সঙ্গে এক্স-রে অনুসন্ধানের জন্য অষ্ট্রিয়ার মহান শহীদ গাইডো হোল্‌জক্নেখ্‌টের প্রথম পরিচয় করিয়ে দিই। বহুদিন হলো, রয়েণ্টজেন অবশ্য মারা গেছেন এবং তেইশ বছর আগে এক্স-রে'র প্রভাবেই হোল্‌জক্নেখটের মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু হয়। কেবল আমিই এখন জীবিত আছি······

এতক্ষণে সাংবাদিক লক্ষ্য করেছেন যে, ডঃ কাইজারের দুই হাতেরই চারটি করে আঙুল নেই! কেবল বুড়ো আঙুল দুটো দু'হাতে আছে।—আমি যদি ভুল না করে থাকি, একটু বিব্রত কণ্ঠে বললেন, আপনি বোধ হয় এই এক্স-রে'র শিকার হয়েছেন।

— আমরা যখন তরুণ ছিলাম, ডঃ কাইজার মন্তব্য করলেন, নতুন

অনুসন্ধানের জন্য আমাদের উদ্যমের শেষ ছিলনা। সর্বক্ষণ ধরে আমরা এক্স-রে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতাম। কোন ঝুঁকি নিচ্ছি— এ-চিন্তাই আমাদের মাথায় আসত না। যদি আমরা জানতেও পারতাম যে, এই এক্স-রে'র প্রভাবে শরীরের অরক্ষিত অংশ জল হয়ে ওখানে টিউমার দেখা দেয়, তাহলেও আমার যথেষ্ট সন্দেহ হয় আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে বিরত হতাম কি না। আমরা হয়তো আর একটু বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতাম—এই পর্যন্ত। কিন্তু, সত্যি বলতে কি, আমরা ঐ রশ্মি সম্বন্ধে তখন কতটুকুই বা জেনেছি? আমরা তখনও কেবল সব সময় নতুন নতুন তথ্য অনুসন্ধান করে এসেছি। আজকের এক্স-রে যন্ত্রপাতি নানারকম নিরাপত্তামূলক কলাকৌশলে সুসজ্জিত এবং একালের কোন চিকিৎসকই আমাদের মত খালি হাতে এক্স-রে'র শক্তি পরীক্ষা করেন না। কিন্তু সীসের পর্দা সম্বন্ধে কতটুকু জ্ঞান ছিল সেদিন আমাদের? আমার কথাই ধরো না, উপযুক্ত পরীক্ষণযোগ্য জিনিসের অভাবে আমি নিজের দু'হাতেরই এক্স-রে ছবি তুলি মাসের পর মাস। ওর ভয়াবহ ফলটা তুমি এখন নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ।

ডঃ কাইজার তাঁর আঙুলবিহীন হাত দু'খানা ওপরে ধরলেন। কিন্তু এটা কি রকম ব্যাপার? সাংবাদিক এবার প্রশ্ন করলেন— একই রশ্মি যা কুৎসিৎ ক্ষত আর টিউমার সৃষ্টি করছে, তাই আবার টিউমারের প্রতিকারের উপায়? ব্যাপারটা যুক্তিহীন মনে হচ্ছে না? আমার অজ্ঞতা মাপ করবেন, এ-বিষয়ে আমি একেবারে অনভিজ্ঞ।

— আমরাও নিজেদের এ প্রশ্ন করেছিলাম, ডঃ কাইজার উত্তর করলেন। উত্তর খুঁজে পেতে দীর্ঘ দিন কেটে গেল। পরে বুঝতে পারলাম, সব ব্যাপারই ঠিক ঠিক পরিমাণ ও পরিমিতির ওপর নির্ভর করে। মাত্রার অতিরিক্ত হয়ে গেলে এক্স-রে'র প্রভাবে ফল মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু অপরদিকে, সঠিক মাত্রার এক্স-রে ব্যতিরেকে আধুনিক চিকিৎসার কথা কল্পনা করা যায় না। প্রথম আবির্ভূত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত এক্স-রে নলের কত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনই না ঘটে গেছে! আজকে আমরা রোগীকে এক সেকেণ্ডেরও কত ক্ষুদ্র অংশ মাত্র এক্স-রে'র সামনে রাখি। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর একেবারে শুরুতে আমি ও গুইডো হোল্‌জক্নেখ্‌ট যখন ভিয়েনার সাধারণ হাসপাতালের মারাত্মক প্লেগ ওয়ার্ডে প্রথম আমাদের এই এক্স-রে উপকরণ স্থাপন করি,

তখন আমাদের এক্স-রে ছিল এত কম শক্তিসম্পন্ন যে পরীক্ষার জন্য কখনো কখনো কয়েকঘণ্টা ধরে ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো।

— আর আপনি?

অষ্ট্রিয়ান এক্স-রে চিত্রণের প্রথম অবস্থায় দীর্ঘদিন কাজ করার পরও, তোমার প্রশ্ন, আমি কি করে বেঁচে রইলাম? একটু হেসে ডঃ কাইজার বললেন, এর রহস্য তোমায় শোনাব। ১৮৯৮ সালে ভিয়েনার সাধারণ হাসপাতালে চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত এক্স-রে পরীক্ষার ভার আমার ওপর ন্যস্ত হয়। এক বছর পরে, আমি আমার বাম হাতে আঘাত পাই— খুবই সামান্য আঘাত কিন্তু ক্ষতটা কিছুতেই শুকাতে চায়না। কি কারণে জানো? কারণ আমার চর্ম ক্রমাগত এক্স-রে ব্যবহার করে করে খুব সাঙ্ঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি কিন্তু ওটাকে তখন কোন আমলই দিই নি। যেমন করে হোক, আমরা তখন এক্স-রে চিকিৎসার রহস্যপূর্ণ দ্বারপ্রান্তে প্রায় পৌঁছে গেছি। তখন কি আর কোন কারণে নিবৃত্ত হওয়া যায়, ঐ গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে পিছু হটা সম্ভব? কিন্তু আমার হাত দু'খানা ঐ এক্স-রে'র শিকার হওয়ায় আমাকে হাসপাতাল ত্যাগ করতে হলো। ঐ হাত দুটো দিয়ে কোন চিকিৎসার কাজ চালানো আর সম্ভব হলো না। ১৯০৯ সালে আমার সদ্য প্রতিষ্ঠিত ভিয়েনা এক্স-রে চিত্রণ কেন্দ্রটি গুইডো হোল্‌জক্নেখ্‌টের হাতে আমি তুলে দিই। ভবিষ্যতে ঐ কেন্দ্রটিই বিকিরণ বিজ্ঞান অনুসন্ধান সংস্থায় পরিণত হয়।

— ১৯০১ সালে? সাংবাদিক জিগ্যেস করলেন। আমাকে একটু ভাবতে দিন। এক্স-রে'র ইতিহাসে ঐ ১৯০১ সাল কি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বর্ষ নয়?

— তুমি ঠিকই বলেছ, ডঃ কাইজার সায় দিলেন।—১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে ষ্টকহোল্মের এক সমারোহপূর্ণ উৎসবের মধ্যে উইলহেল্ম রয়েণ্টজেন সর্বপ্রথম পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন। বলা হলো: তাঁর আবিষ্কৃত ঐ রশ্মি দেহের জৈবিক ক্ষত নিরীক্ষায় ও টিউমারের চিকিৎসায় চিকিৎসকদের সহায়তা করায় তাঁকে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হলো। ইতিমধ্যে মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মে তিনি নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু সদা বিনম্র পুরুষ এই রয়েণ্টজেন পুরস্কারটি পেয়ে অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে জানালেন, আমি এ

পুরস্কারের যোগ্য নই। তিনি ঐ পুরস্কারলব্ধ সমস্ত টাকা তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিলেন। অথচ তাঁর মত অবস্থার লোকের পক্ষে ঐ টাকার পরিমাণ ছিল সত্যিই যথেষ্ট অভাবনীয়। আর তোমার কি জানা আছে, কাকে তিনি দিয়ে গেলেন অত টাকা? উর্জবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে তিনি সমস্ত টাকাটা উৎসর্গ করে গেলেন, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌতিক সংস্থায় বসে তিনি সমুদয় গবেষণা চালিয়ে এক্স-রে আবিষ্কার করেছিলেন।

— কিন্তু আপনি তো আপনার সম্বন্ধে আমায় বলতে যাচ্ছিলেন।

— নিজের কথা বিশেষ কিছু আর বলার নেই। ১৯১4 সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে বাহাত্তর হাজার এক্স-রে পরীক্ষা চালাই এবং পরিণামে কমপক্ষে উনষাটটি এক্স-রে জনিত ক্ষত আমার দেহে দেখা দেয়। ১৯১৯ সালের মধ্যে আমার দেহে আটটি শল্য চিকিৎসা হয়। বিস্তারিত তথ্য না-ই বা জানালাম। তখনই আমার বাঁ হাতের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আঙুলটি খোয়া যায়। তিন বছর পরে আমার ডান হাতের চারিটি আঙুলই কেটে বাদ দেওয়া হয়। এরও ছ' বছর' পরে আমার বাঁ হাতের সবচেয়ে ছোট আঙুলটি যায়। ঘটনাক্রমে দু' হাতের কেবল বুড়ো আঙুল দুটো বেঁচে যায়।

— আমার জীবনটা বেঁচে যায়, ডঃ কাইজার বলতে লাগলেন, ঘটনাক্রমে ১৯২২ সালে আমি এক্স-রে থেকে অব্যাহতি নিয়ে অন্য কাজে আত্মনিয়োগ করি। ভিয়েনা থেকে আমি চলে আসি এবং পাহাড়ে গরম জলের ঝরণা সংস্থাপন কেন্দ্রের নির্দেশক রূপে কাজ করতে থাকি। আর মাত্র এক বছর এক্স-রে বিকিরণের মুখে থাকলে বন্ধু গুইডো হোল্‌জক্লেখ্‌টের মতই আমার শেষ দশা হতো। আমার মতো ও কর্মত্যাগ করে আসতে পারে নি। তার ডান হাতটা যখন খোয়া যায়, তখনও ও বাঁ হাত দিয়ে কাজ করে চলেছে। বলতে গেলে, এক্স-রে'ই ওকে পুড়িয়ে মারে। উনষাট বছর বয়সে বিকিরণ বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে কাজ করতে করতে ও শহীদের মৃত্যু বরণ করে। প্রিয় বন্ধু, বিজ্ঞানে মাঝে মাঝে এমন শহীদের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়। বিজ্ঞানের প্রগতির স্বার্থে উৎসর্গীকৃত প্রাণ; এ সব বীর শহীদরা ছাড়া আজকের মানুষের অনেকের অস্তিত্বই সম্ভব হতো না, আজকের জীবিত মানুষদের অনেকেই অনেক আগে মারা পড়তেন।

— কিন্তু এই আজীবন ত্যাগের বিনিময়ে কি পেলেন ? সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন। যতদূর পড়েছি, রয়েণ্টজেনকেও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন উৎসর্গ করতে হয়। যতদূর মনে পড়ে, স্মৃতিশক্তি আমার সঙ্গে কপটতা না করলে, তিনি পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেই মারা যান।

— আমার মনে হয়, ডঃ কাইজার জানালেন— তুমি একদিক থেকে ঠিক, আবার অন্য দিক থেকে ভ্রান্ত।

মানুষের প্রগতির ও অগ্রগতির ইতিহাসে এইসব অগ্রণীদের, বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বই ওদের কাছে সবচেয়ে বড় পুরস্কার, জয়মাল্য। এক্স-রে মানুষের রোগগ্রস্ত জীবনে মস্ত বড় আশীর্বাদ, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই আশীর্বাদের পশ্চাতে আছে বিকিরণ বিজ্ঞানের, পথিকৃৎদের অনেক দুঃখ অনেক দারিদ্র্য, ওঁদের অনেক রোগ বহন করতে হয়, ধীরে অথচ নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হতে হয়। আমার কথাই ধরো না। এক্স-রে চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমি ওঁদের মত কাজ করেছি। যদিও আমার দান খুব সামান্য। আমি তোমায় নির্দ্বিধায় বলতে পারি। প্রকৃতির অন্তঃপুরের একটি রহস্য উদ্ধার করতে পেরেছি এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে কিছু করে যেতে পেরেছি, শুধু এই গৌরবময় অনুভূতির বিনিময়ে আমি আমার এ দুটো হাতও বিজ্ঞানের কাজে আবারও উৎসর্গ করতে পারি। বিশ্বাস করো, এটাই বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আনন্দের বিষয়, সবচেয়ে গৌরবময় প্রাপ্তি। রয়েণ্টজেন এ আনন্দলোকের যাত্রী ছিলেন। যদিও যুদ্ধোত্তরকালের মুদ্রাস্ফীতি তাঁর জীবনের সামান্য সঞ্চয়টুকুও শোষণ করে নিয়েছিল। তাঁর প্রিয়তমাকে এই দুঃখকষ্টের বোঝা বহন করতে হবে না, এটাই ছিল তাঁর পরম সান্ত্বনা। ১৯১৮ সালে জার্মানির পতনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মারা যান। সারা পৃথিবী রয়েণ্টজেনকে আবার স্মরণ করল ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪, যেদিন তিনি লোকান্তর যাত্রা করেন। যা হোক তোমার কথাই ঠিক। তাঁর মৃত্যু-সার্টিফিকেট লেখা হলো : ডঃ উইলহেল্ম রয়েণ্টজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, জন্ম ১৮৪৫, বিপত্নীক, মৃত্যুর কারণ : পুষ্টিহীনতা। কিন্তু তাতে কি এসে যায় ! পৃথিবীকে তিনিই তো এক্স-রে উপহার দিয়ে গেছেন।

ডঃ কাইজার উঠে দাঁড়ালেন। সেই জন্যেই কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম, মৃত্যুর পর এই পৃথিবী হয়তো আমায় মনে রাখবে। এ-কথা মনে রাখতে

হবে যে আমাদের কোন দুঃখ নেই। আমাদের যা সাধ্য করেছি। এই জ্ঞানই যে কোন ত্যাগের সমান। আমরা পৃথিবীতে তার প্রগতির পথে একটু একটু এগিয়ে দিয়েছি। আমরা রোগ, দুঃখ ও মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামের ব্যাপারে মানবজাতিকে সাহায্য করেছি। মানুষ জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে যা প্রার্থনা করে, এ কি তার চেয়ে অতিরিক্ত নয়? সারাজীবন ধরে সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের চেয়ে এটা কি উন্নততর কিছু নয়?

সরাইখানার পরিচারক ডঃ কাইজারের মাথায় টুপিটা পরিয়ে দিল।

— এবার বোধ হয় তুমি বুঝতে পারছো, টুপিটা মাথা থেকে তুলে তোমায় কেন অভিবাদন জানাতে পারি নি, ডঃ কাইজার সাংবাদিককে জানালেন। তোমার ভাগ্য সুসম্পন্ন হোক, বিদায় বন্ধু, বিদায়!

কাটা ডানহাতের বুড়ো আঙুলটা দিয়ে মাথার টুপিটার প্রান্ত কোনরকমে ছুঁয়ে তিনি সাংবাদিক ভদ্রলোককে নমস্কার জানালেন।

পরমাণু-কেন্দ্রের রশ্মি

বোহেমিয়ার ছোট্ট শহর জোয়েকিমস্থলে দুই শতাব্দীরও অধিক কাল ধরে পিচব্লেণ্ড নামক এক খনিজ ধাতুর খনন কার্য চলতে থাকে। বহুদিন ধরে ঐ স্থানটি খনিজ ধাতুর ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। মধ্যযুগে ঐ স্থানের খনিজ পদার্থ য়ুরোপের টাঁকশালের উজ্জ্বল ধাতুর রৌপ্য সরবরাহ করেছে। পরবর্তী-কালে দেখা গেল, কখনো কখনো সবুজ আভাযুক্ত সাধারণত কালো রঙের এই খনিজ পদার্থ পিচব্লেণ্ড, এতদিন মূল্যহীন খনিজ পদার্থ হিসাবে বিবেচিত হলেও উজ্জ্বল বর্ণের রং তৈরির কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। কিছুদিন যেতে না যেতে বোহেমিয়ার চীনামাটি ও কাচের কারিগরদের মধ্যে এই উজ্জ্বল রঙের চাহিদা খুব বেড়ে গেল। আর জোয়েকিমস্থলের অধিবাসীরা, যাঁরা রূপার যোগান কমে আসায় খুব সঙ্কটে পড়েছিলেন, তাঁরাও এই পিচব্লেণ্ডের বাজার পেয়ে খুব খুশি হলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হায়েনরিখ ক্লাপ্রথ নামে এক অধ্যাপক পিচব্লেণ্ডকে রাসায়নিক বিশ্লেষণে বিশ্লষিত করলেন। বিশ্লেষণের পরে দেখা গেল, এর মধ্যে, এ-যাবৎ অজ্ঞাত এক রাসায়নিক মৌল আছে। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঐ খনিজ পদার্থের নাম দিলেন 'ইউরেনিনাইট এবং নতুন ধাতুটির নামকরণ করলেন 'ইউরেনিয়াম'।

রং তৈরীর কাজে ইউরেনিয়াম খনিজের ব্যবহার শুরু হলো। রং-য়ের 'এজেন্ট' হিসেবে কাজ করল উইরেনিয়ামের বিভিন্ন উচ্চমান সম্পন্ন অক্সাইডগুলো, অথচ ওদের ইউরেনিয়াম থেকে বিশিষ্ট কোন গুণ পরিলক্ষিত হলো না। ব্যবহারান্তে অবশিষ্ট পরিত্যক্ত অংশগুলো অর্থাৎ পিচব্লেণ্ডের যে ভাগ রঙের কারিগরের কোন কাজে লাগল না, সেইগুলো স্তূপে স্তূপে জমে উঠল এবং সেখানেই রয়ে গেল আবর্জনা হিসেবে। কয়েক শতক চলে গেল কিন্তু ঐ আবর্জনাগুলো নিয়ে কারুরই চিন্তা ভাবনা দেখা দিল না। কেউ তাদের

স্পর্শ পর্যন্ত করল না। জোয়েকিমস্‌থলের এই আবর্জনাস্তূপ যে অপরিচিত ধনভাণ্ডার বুকে করে দাঁড়িয়ে আছে—কারুর মনেই এ-সন্দেহ সে দিন জাগে নি।

১৮৮০ সালে কিন্তু সারা পৃথিবীর রসায়নবিদেরা উইরেনিয়াম মৌল নিয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুরু করলেন। মেণ্ডেলিভ নিজে এর আণবিক ওজন নির্ণয় করলেন ২৪০ এবং এর আণবিক ওজন এত উচ্চমানের হওয়ায় মেণ্ডেলিভ ওকে পর্যায় সারণির একেবারে শেষে ক্রোমিয়ম্‌, মালিবডিনম ও টাংষ্টেনের একই লম্বালম্বি ঘরে ঠাঁই করে দিলেন।

প্যারিসে হেনরী বেকরেল পিচব্লেড নিয়ে ■ হলেও বিভিন্ন প্রকারের ইউরেনিয়াম সল্ট নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন পদার্থবিদ্‌ এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সংগ্রহশালার অধ্যাপক, আলোক ও বিকিরণ বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ তাঁর পিতার পদটি অভিষিক্ত করেছিলেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৬—মানবজাতির ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করল। বেকরেল প্রতিদীপ্তির ধাঁধাটা ব্যাখ্যা করার জন্য কয়েকটি পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। ধাঁধাটির বিষয় হলো, আলোকরশ্মির প্রভাবে কোন কোন পদার্থের উজ্জ্বলভাবে প্রতিদীপ্ত হবার বিশেষ ক্ষমতা। তিনি ইউরেনিয়াম সল্ট নিয়ে কাজ করতে করতে দেখলেন, এই পদার্থটির বিশেষ ক্ষমতা আছে।

হঠাৎ কি হলো তাঁর। চল্লিশ বৎসর বয়সের গম্ভীর প্রকৃতির মানুষটি হঠাৎ গান গেয়ে উঠলেন। নতুন কোন ভাবনা তাঁর মনে দোল খেয়ে গেলেই তিনি অমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেন, গাম্ভীর্যের মুখোশ খুলে পড়ত তাঁর, গান গেয়ে উঠতেন তিনি। তিনি নিজের ভৃত্য, তাঁর প্রতি নিবেদিত প্রাণ এক বৃদ্ধকে বললেন, জ্যাক, আমরা এবার ঐ ইউরেনিয়াম সল্ট সূর্যের আলোকে ধরব। আমি দেখতে চাই, এর ফলে ওর কি ধরনের বিকিরণ ঘটে।

— আপনি এই বিকিরণ কি ভাবে প্রমাণ করবেন, স্যর ?

— কেন অতি সহজেই! একটা ছবি তোলার প্লেট নিয়ে ওকে সাধারণ আলো থেকে মুক্ত করার জন্যে কালো কাগজে জড়াব, তারপর ইউরেনিয়াম সল্টটা ওই মোড়কের মধ্যে রাখব।

বলতে না বলতেই তাই করা হলো। বেকরেল ছোট্ট প্যাকেটটা সূর্যের আলোয় ধরার জন্যে পরীক্ষাগারের জানালায় রেখে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ওটা জানালার কাছ থেকে নিয়ে এসে অন্ধকার কক্ষে অন্তর্হিত হবার আগে ওটাকে ঐ অবস্থায় কিছুক্ষণ রেখে দিলেন, যাতে সল্টটা ফটোর প্লেটের ওপর ভালভাবে কাজ করতে পারে।

প্রভুর অনুপস্থিতির অবকাশে পরীক্ষাগারের ব্যবস্থাপক তাড়াতাড়ি ঘরটার ধুলোগুলো পরিস্কার করতে গেল। তার মনে হয়েছিল: কাজটা বিশেষ জরুরী।

প্রায় কুড়ি মিনিট পরে বেকরেল ফিরে এলেন। তাঁর কণ্ঠে বিজয় উল্লাস। — আহা, আমরা কেল্লা মেরে দিয়েছি। ফটো প্লেটটা নাড়াতে নাড়াতে তিনি বললেন, চেয়ে দেখো, তুমি ইউরেনিয়াম সল্টের রেখাগুলো স্পষ্ট দেখতে পাবে! সূর্যালোক নিশ্চয়ই এই বিকিরণ ঘটিয়েছে। কেবল প্রক্রিয়াটা আমি ঠিক ধরতে পারছি না। যাই হোক আমি প্লেটটা কালো কাগজে ভালোভাবে জড়িয়ে রেখেছিলাম। সুতরাং আমি নিঃসন্দেহ, সূর্যালোক কোন না কোন ভাবে ওর রশ্মি নির্গমনের সহায়তা করেছে। তুমি কি ভাবছো, দুর্ঘটনা!

বেকরেল আর একবার কালো কাগজে একটা ফটোপ্লেট ও একটু ইউরেনিয়াম সল্ট মুড়লেন। কিন্তু মোড়কটা জানালার কাছে নিয়ে গিয়ে ভীষণ নিরাশ হলেন। সূর্য ঘন মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে।

— ফেব্রুয়ারীর সূর্যের ওপর আস্থা রাখা দায়। তিনি বিড় বিড় করে উঠলেন। আজকের মত পরীক্ষাটা স্থগিত রাখতে হবে।

কিন্তু খারাপ আবহাওয়া চলতে থাকল। পরের কয়েক দিনও সূর্য মেঘে ঢাকা পড়ে রইল। হেনরীর বেকরেলের প্যাকেটটা আর রোদে দেবার সুযোগ জুটল না।

শেষে তিনি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুলেই গেলেন।

১লা মার্চ পরীক্ষাগারের ব্যবস্থাপক টেবিলের ড্রয়ারটা খুলল। স্যর, এখনো তো সূর্য উঠল না, সে বলল। এই প্লেটটা তাহলে ফেলে দিই, কেমন?

বেকরেল অন্য কোন পরীক্ষায় ডুবে ছিলেন। অন্যমনস্কভাবে তিনি মাথা নাড়লেন। কিন্তু একটু পরেই কি ভেবে আবার বললেন—আচ্ছা, নিয়ে

এস তো ওটা। আমি ওটা পরিস্ফুটিত করে দেখব। বলা যায় না, স্ফটিকের আবছা আবছা সীমারেখাও ফুটে উঠতে পারে।

আধঘণ্টা পরে এই ফরাসী বিজ্ঞানী খারাপ আবহাওয়ার জন্যে নিজেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে এই খারাপ আবহাওয়া যেন এক টুকরো সৌভাগ্যের সোনার আলো বহন করে এনেছিল। কারণ ফটোর প্লেটটা পরিস্ফুটন করে বেকরেলের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। আনন্দে বিস্ময়ে আত্মহারা বেকরেল। ইউরেনিয়াম সল্টের স্ফটিকগুলোর রেখাগুলো স্পষ্ট উঠেছে— প্যাকেটটা সূর্যের আলোয় উন্মুক্ত করে দিলে যেমন স্বচ্ছ হতো, ঐ ছবির রেখা ঠিক তেমনি স্বচ্ছ, স্পষ্ট, অবিকল।

ওঁর পুরাতন সহায়ক কিন্তু বেকরেলের এই আনন্দের কারণ কি, কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। প্রভুর এত উত্তেজনা, এত আনন্দ এর আগে সে কোনদিন লক্ষ্য করে নি।

আমি কি বোকা, বেকরেল বলে উঠলেন। এই ইউরেনিয়াম যৌগিকের মধ্যে প্রতিদীপ্তি পরীক্ষা করার চেষ্টা করছি। প্লেটটার দিকে একবার তাকাও। এই কালো কালো রেখাগুলো রশ্মি, রশ্মি। একেবারে নতুন ধরনের রশ্মি। যাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত মানুষের কোন ধারণাই ছিল না। ইউরেনিয়াম সল্ট যে নিজেই রশ্মি বিকিরণ করে। আমি এখনই তা তোমার কাছে প্রমাণ করে দেখাচ্ছি। জ্যাক, ঘরটা অন্ধকার করো। আমি আবার পরীক্ষা করব, আমার নতুন প্লেটটি যদি আবার ঐ রশ্মির সংস্পর্শে কাজ করে, তা হলে আমার সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত যে ঐ রশ্মি ইউরেনিয়াম সল্ট থেকে আসছে। বিকীর্ণক পদার্থ! বিকীর্ণক পদার্থ! কেমন কবিতার মত শোনাচ্ছে না শব্দগুলো!...

দু'বছর পরের কথা। গ্লাসিত্র পথের অতি সাধারণ আসবাব পত্রে সজ্জিত একটা ফ্ল্যাটে ত্রিশ বৎসর বয়স্কা এক মহিলা তাঁর স্বামীর বাড়ি ফেরার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। তাঁর স্বামী একজন পদার্থবিদ্। পীরি কুরী তাঁর নাম। রু লোমণ্ড স্কুলের পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার শিক্ষক। এই শিক্ষকতার জন্য তাঁর মাসিক বেতন ৫০০ ফ্রাঙ্ক— যা বিশেষ করে নবাগতা শিশুকন্যা সমেত এই পরিবারের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়।

অবশ্য এ-কথা ঠিক, সাত বছর আগে, মেরী স্কলোঁডাউস্কার প্যারিস থেকে ওয়ারশ'য় আসার সময় অবস্থা আরও খারাপই ছিল। সেই সময় সোরবনে পড়ার সময় মাসে মাত্র ৯০ ফ্রাঙ্কে তাঁকে চালাতে হতো ; অর্থাৎ দৈনিক তিন ফ্রাঙ্কের মধ্যে তাঁকে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। অথচ তখনও তাঁর মনে কোনদিন এ-ভাবনা দেখা দেয় নি যে, রসায়নসূত্র, রিটার্ট ও টেষ্ট টিউবের সঙ্গে তাঁকে একদিন শিশুপালন ও ঘর-কন্নার কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে।

পড়াশুনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও গৃহস্থবধূ হিসেবে তাঁর যে অতিরিক্ত ভূমিকা ভবিষ্যতে দেখা দেবে, এ-ভাবনায় তিনি কোনদিনই অভ্যস্ত ছিলেন না। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পীরি কুরীর সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম দেখা, তখন প্রথম দর্শনেই জাগে প্রেম। কি প্রেমের চেয়েও অতিরিক্ত কিছু। প্রথম সাক্ষাতের পর থেকেই ছু'জনেই ছু'জনের এই মিলন পূর্বজন্ম নির্ধারিত হিসেবে গণ্য করেছিলেন, যা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমানা ডিঙিয়ে স্ত্রী-পুরুষের ব্যষ্টিগত স্বার্থবিরোধী বৃহত্তর কোন জগতে বিস্তার লাভ করেছিল। গণিতের নানা জটিল প্রশ্ন, তড়িৎ শক্তি মাপার জন্য সম্যক উপকরণের উদ্ভাবন, স্ফটিকের ভৌতিক তত্ত্ব এবং চৌম্বকত্বের মূল নিয়ম প্রভৃতি বিষয়ে ছু'জনের মধ্যে নানা আলোচনা, চিন্তা-ভাবনার আদান প্রদান চলতে থাকে। আলোচনার মধ্য দিয়েই ছু'জনের মধ্যে সম্পর্ক গভীরতর হতে থাকে, ভালবাসা নিবিড়তর হয়ে ওঠে! প্রথম প্রথম উভয়ের পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবার কোন কথাই ওঠে নি, কারণ পীরি চিকিৎসাবিদের সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে আর মেরী পোল্যাণ্ডের ব্যাকরণ স্কুলের অতি সাধারণ শিক্ষক, লাডিমল স্কলোডাউস্কার কন্যা। আর তাঁদের ও-কথা চিন্তা করার সময়ও ছিল না। উভয়েই বিজ্ঞানের সাধারণ স্বার্থে মন-প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। যখনই পীরি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আসেন, তখনই মেরী নিজের কাজের কোন না কোন বিষয়ের জটিল বৈজ্ঞানিক সমস্যার কথা পড়েন এবং পদার্থবিদ্ তাঁর প্রেমিক হৃদয়ের সমস্ত ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্খা, কামনা বাসনার কথা মুহূর্তের মধ্যে বিস্মৃত হন।

কিন্তু একে অন্যের কাছ থেকে যখন দূরে সরে যেতেন তখন বিরহের বেদনায় ছু'জনেরই হৃদয় ও মন আকুলি-বিকুলি করে উঠত, পরস্পরের মন এক ছুর্নিবার আকর্ষণে পরস্পরকে কাছে টানত, ছু'জনেই উপলব্ধি করতেন যে,

তাঁরা কেবল উন্মাদগ্রস্ত আত্ম-ভোলা পদার্থবিদ্‌ই নন, তাঁরা দেহ-মনে রক্ত-মাংসের মানুষ এবং তাঁরা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক দিক থেকেই নয়, প্রেমের এক নিবিড় বন্ধনে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। মেরী যখন প্রথম সুইজারল্যাণ্ডে এবং পরে তাঁর জন্মভূমি পোল্যাণ্ডে যাত্রা করেন, তখন পীরি সহসা উপলব্ধি করেন যে তিনি মেরীকে ছাড়া বাঁচতে পারবেন না। মেরী ছাড়া তাঁর জীবন অর্থহীন। শুধু গবেষণাগারেই নয়, মেরীর অভাব নিজের ঘরেও তিনি দিবারাত্র অনুভব করতে থাকেন। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন : ওঁকে বিবাহ করবেন।

তবু মেরী স্কোলডাঁউস্কা থেকে মাদাম কুরীতে রূপান্তরিত হতে আরও এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। পীরির প্রতি তাঁর আকর্ষণ সম্বন্ধে মেরীর মনে কোন দ্বিধা ছিল না, কিন্তু তাঁর সন্দেহ ছিল : পত্নী, গৃহিনী এবং জননী হিসেবে তিনি কতখানি সার্থকতা লাভ করতে পারবেন। পোল্যাণ্ডে অবশ্য তিনি কিছুদিন গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন, ছেলেপিলে মানুষও করেছিলেন, কিন্তু ঘরকন্না বা রান্নাবান্নার কাজ তিনি আদৌ জানতেন না। তাছাড়া, তাঁর কুমারী জীবনে যখন তিনি ওয়ারশ'য় অধ্যয়নের কাজে ব্যস্ত, তখন যৎসামান্য টাকায় তিনি নিজের খাওয়া-পরার চাহিদা মেটাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলেন। স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর করার আশা তিনি কি করে করবেন? এ ছাড়া আর একটা চিন্তাও তাঁর মাথায় ঘুরত। বিজ্ঞানের স্বার্থে তিনি জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন, গবেষণাগারে তিনি যে সময়টার সদ্ব্যবহার করতে পারেন, সেই অমূল্য সময় রান্নাঘরে অতিবাহিত করতে তাঁর মন সায় দিত না।

পীরিকেই ধৈর্যসহকারে লেগে থাকতে হলো, মেরীকে বিবাহের জন্য বার বার পীড়াপীড়ি করতে হলো। বোঝাতে হলো : তাঁদের ব্যাপারটা অন্য-রকম। এই বিবাহের ফলে উভয়ের কাজের আরও সুবিধে হবে। উভয়ে উভয়ের নিরবিচ্ছিন্ন সহচর হয়ে উঠবেন। এমন কি পুরুষ ও নারী হিসেবে তাঁদের মিলিত জীবন তাঁদের যৌথ বিজ্ঞানের স্বার্থ ও বিজ্ঞানের অনুসন্ধান দ্বারা পূর্ণতর হয়ে উঠবে।

তিন বছর পরে শিশু আইরিনের জন্ম হলো। মেরী যেন অনেকখানি বেঁচে গেলেন। প্রসবকালীন শেষ কয়েক সপ্তাহে মেরীর খুব দুঃখ হলো যে তিনি নিজের পায়ে বেশিক্ষণ দাঁড়ানোর শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন, বিভিন্ন

ধাতুর চৌম্বকের ধর্ম অনুসন্ধানের জন্য উপকরণগুলো বেশিক্ষণ ব্যবহারের শক্তি পর্যন্ত তাঁর নেই।

কিন্তু এখন, শিশু আইরিনকে দোলনায় শুইয়ে তাঁদের সংসারে আবার আনন্দ ফিরে এলো। ওকে পেয়ে মেরীর জননী হৃদয়ের আনন্দ আর ধরে না। এমন কি আইরিনকে পেয়ে বিজ্ঞানের সবচেয়ে প্রেরণাদায়ক তত্ত্বও মেরীর কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল।

শিশু জন্মাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাদাম কুরীর জীবনের দ্বৈত ভূমিকা শুরু হয়ে গেল : গৃহিনী ও বিজ্ঞানী।

পীরির স্বল্প বেতন ; শিশুকে পালনের জন্য ধাত্রী রাখার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সুতরাং মেরীকেই নিজের ঘরটা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, নিজেদের সাধারণ আহার প্রস্তুত করা, টেম্পারড্ ইস্পাতের চৌম্বকত্বশীর্ষক প্রবন্ধটি শেষ করা এবং শিশু আইরিনের পরিচর্যা করা, সবই করতে হতো।

জানুযারি, ১৮৯৮। মেরী কুরী স্বামীর জন্যে একদিন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন। রান্না করা হয়ে গেছে, স্বামী ফিরলে একটু গরম করে দিলেই হবে। আইরিন নিজের ছোট্ট পালঙ্কে শুয়ে শান্তিতে ঘুমোচ্ছে ; তার মুষ্টিবদ্ধ ছোট্ট হাত দু'টি তার গালের ওপর রাখা। বারো মাসের শিশুটিকে এই অবস্থায় কয়েক মিনিটের জন্য রেখে যাওয়া যায় ভেবে মেরী স্বামীর সঙ্গে যে বিষয়ে যৌথভাবে পড়াশুনা চালাচ্ছিলেন, সেই বিষয়ে মন নিবিষ্ট করতে গেলেন।

তাঁর সহকর্মী হেনরী বেকরেল বিজ্ঞান আকাদেমীতে যে নিবন্ধটি পাঠিয়েছিলেন, তিনি আর একবার তাতে ডুবে গেলেন।

নিবন্ধটিতে বেকরেল ইউরেনিয়াম সল্ট নিয়ে তাঁর আলোড়নকারী অনুসন্ধানের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বিকীর্ণক পদার্থ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মেরী প্রবন্ধটি পড়ে এত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, তিনি প্রায় তখনই স্থির করে ফেললেন : বেকরেলের এই রহস্যময় রশ্মিই হবে আমার আলোচনার বিষয়।

অবশেষে পীরি ফিরে এলেন। মেরী ছুটে গেলেন তাঁর কাছে। পরম উত্তেজনায় বলে উঠলেন—আমার আলোচনার বিষয় আমি খুঁজে পেয়েছি, পীরি। কিন্তু আমি চাই, তুমি আমাকে এ-বিষয়ে সাহায্য করো।

প্রায় শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে বেকরেলের ইউরেনিয়াম রশ্মির ওপর অনুসন্ধানের বিষয়টি তিনি স্বামীকে জানালেন। দীর্ঘ পনের মিনিট ধরে তিনি বলেই চললেন, অন্যদিকে কোন খেয়ালই নেই তাঁর। অবশেষে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন। কী আশ্চর্য, এখনো তুমি কিছুই খাওনি: আমি কি অপদার্থ, গৃহিনী পীরি! আমি বিকিরণের ওপর বক বক করে মরছি, অথচ তুমি উপবাসী।

পীরি পরম আবেগে তাঁর বাঁ হাতটি চেপে ধরলেন। আমার খাবার কথা নিয়ে তোমায় অতো বিব্রত হতে হবে না। আগে তোমার কথা শেষ করো। বলো, কি বলছিলে? যাক আমি বিশ্বাস করি, তুমি এতদিনে তোমার মনের মত বিষয় খুঁজে পেয়েছ। সত্যিই তোমার এ-কাজ খুবই মূল্যবান হবে।

দু'ঘণ্টা বাদে কুরীদম্পতি স্থির করলেন, তাঁরা বেকরেলের রশ্মি নিয়ে বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান করবেন। পীরি তখনও কিছু খান নি। আইরিনের ঘুমন্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁরা তখনই বসে গেলেন তাঁদের অনুসন্ধানের একটা বিস্তারিত কর্মসূচী স্থির করার কাজে। কিন্তু তাঁরা দারিদ্র্য পীড়িত, নিজেদের কাজের উপযোগী একটা গবেষণাগারের ব্যবস্থা করা তাঁদের সাধ্যের বাইরে। স্থির হলো, পীরির স্কুলে একটা আপৎকালীন প্রয়োগশালা তৈরী করে মেরী কাজ করবেন।

— আমার সেই পুরনো গুদামঘরের কথা তোমার মনে আছে মেরী— পীরি কুরি জিগ্যেস করলেন। যত সব আজে-বাজে আবর্জনায় ভরা, স্যাঁৎসেতে। তাপ নিয়ন্ত্রণেরও কোন ব্যবস্থা নেই। কোন কোন অনুসন্ধানের ব্যাপারে খবরটা বরং খারাপই হবে। কিন্তু ওটাই তোমার সম্বল। এই মুহূর্তে ওটাই কোনরকমে ব্যবস্থা করা যায়। কেউই তো ওটা ব্যবহার করছে না, এটাই ভরসা। আর তার চেয়েও বড় কথা, ওটা ব্যবহার করার জন্য আমাদের এক পেনিও দিতে হবে না।

— কিন্তু আমাদের আর একটা কথাও ভাবতে হবে, পীরি, মেরীর কণ্ঠে অপরাধীসুলভ মনোভাবের সুর। তোমার স্কুলে আমার গবেষণাগারটা হলে আইরিনের কি হবে? তাকে তো আর ঐ স্যাঁৎসেতে ঘরে নিয়ে গিয়ে আমি তুলতে পারব না। এখানে তাকে ফেলে রেখে যাওয়াও সম্ভব নয়।

কিন্তু ঐ সমস্যাটা সহজেই কেটে গেল। মেরীর এক বিবাহিতা বোন তখন প্যারিসে। মেরী যতদিন গবেষণাগারে কাজ করবেন, ততদিন তিনিই তাঁর এই বোনঝিটিকে দেখাশোনার জন্যে সাগ্রহে তাঁর সম্মতি জানালেন। কাঁধ থেকে মস্ত দুশ্চিন্তার বোঝাটা সহজেই নেমে গেল। বেকরেলের রশ্মির ওপর অনুসন্ধান চালাবার জন্যে এবার কুরীদম্পতি তাঁদের মন-প্রাণ ঢেলে দিলেন।

কিন্তু লোমণ্ডে পীরির গুদাম-ঘরে গবেষণাগারের সমস্ত সাজসরঞ্জাম সাজানো অতো সহজ ছিল না। অত্যন্ত সংবেদনশীল বিদ্যুৎ-মাপক যন্ত্রপাতি নিয়ে অনুসন্ধান চালানো ওখানে সত্যই দুরূহ ছিল। কিন্তু ওটাই অন্যতম সমস্যা নয়। মেরীকে সবচেয়ে বেশী কষ্ট দিচ্ছিল ওখানকার সাঁৎসেতে ভীষণ ঠাণ্ডা আবহাওয়া। ৮ই ফেব্রুয়ারী ওখানকার তাপমাত্রা মাত্র ৪১ ডিগ্রি।

কিন্তু মেরী কুরীর ধনুক ভাঙা পণ, কর্মে অবিচল নিষ্ঠা। স্যাঁতসেতে আবহাওয়ার জন্যে দমে যাবার পাত্রী তিনি নন। তিনি ইউরেনিয়াম রশ্মির আয়নীকারক প্রভাব অনুসন্ধান করতে লাগলেন—অর্থাৎ তিনি অনুসন্ধান করতে লাগলেন ঐ রশ্মির বাতাসকে বিদ্যুৎ সংবাহক করার ক্ষমতা। কাজটা তিনি করলেন বেকরেলের রশ্মি দ্বারা বিদ্যুৎ-মাপকযন্ত্রকে বিসর্জিত করে। এটা স্বামীর সহায়তায় কিছুদিন আগে উদ্ভাবন করেছিলেন। প্রক্রিয়াটা বর্তমানে খুব কাজে লাগল।

ফেব্রুয়ারীর শেষাশেষি তিনি তাঁর প্রথম সাফল্যের কথা ঘোষণা করতে পারলেন।

— আমি অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছি যে, স্বামীকে বললেন, খনিজ-নমুনায় ইউরেনিয়ামের পরিমাণের ওপর রশ্মির তীব্রতা নির্ভর করে—এই দু'টি পরস্পর আনুপাতিক। আর একটা ব্যাপার হলো: ইউরেনিয়ামের রাসায়নিক গঠন থেকে ওর বিকিরণ স্বতন্ত্র। এছাড়া এই বিকিরণ আলোক তাপমাত্রা প্রভৃতি বাইরের কোন অবস্থার ওপরও নির্ভরশীল নয়।

— ওটা তোমার পক্ষে খুব মঙ্গলের, পীরি মন্তব্য করলেন। তা না হলে এই সাঁৎসেতে ঘরে তোমার পক্ষে ঐ রশ্মির ওপর কাজ করা সম্ভবই হতো না। পীরি হাত দুটো ঘসতে লাগলেন, কাঁপতে শুরু করলেন।

— আমার কি সন্দেহ হয়, জানো? মেরী বলতে লাগলেন, ইউরেনিয়ামই

বোধহয় একমাত্র মৌল নয় যা এমন রশ্মি বিকিরণ করে। অন্য মৌলরাও এমন রশ্মি বিকিরণ করবে না কেন? সম্ভবত বেকরেল যে ইউরেনিয়াম মৌলের ওপরই কেবল এটা লক্ষ্য করেছেন, সেটা একটা দুর্ঘটনা। তুমি যদি আমায় একটু সাহায্য করো, পীরি, আমি একটার পর একটা মৌল নিয়ে পরীক্ষা চালাতে চাই, দেখতে চাই ওরাও অমন রশ্মি বিকিরণ করে কি না।

পীরিও মেরীর মতই এই পরীক্ষায় খুব আগ্রহী। তাঁরা তাঁদের ইউরেনিয়ামকে আলাদা করে রাখলেন এবং অন্য মৌল নিয়ে পরীক্ষা শুরু করে দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে পীরির ঐ স্কুলে বিভিন্ন মৌলের ভালো সংগ্রহ ছিল। লম্বা একটা নমুনার ফর্দ যত্নসহকারে পরীক্ষা করা হলো একের পর এক এবং আশ্চর্যজনক একটা আবিষ্কারের জন্ম হলো। দেখা গেল, থোরিয়াম, মেণ্ডেলিভের পর্যায় সারণিতে যার স্থান, ইউরেনিয়ামের দু' ঘর দূরে, যৌগিক ও অনুরূপ রশ্মি বিকিরণ করে। বস্তুত থোরিয়াম অক্সাইডের বিকিরণের তীব্রতা ধাতব ইউরেনিয়ামের চেয়ে বেশি।

মেরী কুরী জয়যুক্ত হলেন।—তা হলে আমার অনুমানই সত্য। শুধু ইউরেনিয়াম নয়, থোরিয়ামও রশ্মি বিকিরণ করে: এই বিকিরণ তা হলে বেশ কিছু সংখ্যক মৌলের একটি বৈশিষ্ট্য। বিকিরণের এই ক্ষমতার একটা নামকরণ করা দরকার। তোমার মতে এর কি নাম হওয়া উচিত পীরি?

এই আবিষ্কারটা তুমিই করেছ, অতএব নামটা তোমারই দেওয়া উচিত।

'তেজস্ক্রিয়তা' রাখলে কেমন হয়? এটাই বোধ হয়, আমরা যা অনুসন্ধান করে পেলুম তাকে নির্ভুলভাবে বোঝায়—কিছু মৌল আছে সক্রিয়ভাবে রশ্মি বিকিরণ করে।

- অথবা তোমার সদ্য দেওয়া নামানুসারে তারা তেজস্ক্রিয় মৌল।

—বেশ, আমাদের কাজ আরম্ভ করা যাক। এসো, আমরা বিদ্যুৎ-পরিমাপক যন্ত্রটাকে আবার চার্জ করে নিই। আমাদের এখনও অনেক খনিজ-ধাতু নিয়ে পরীক্ষা চালাতে হবে। আমরা হয়তো রহস্যের চাবিকাঠিটা হাতে পেয়ে যাব। এমন কি তেজস্ক্রিয়তার মূল কোথায়—এই রহস্যটাও উদ্ধার করে ফেলতে পারি। ঐ রহস্যাচ্ছাদিত রশ্মিগুলো কোথা থেকে আসে?

বেশ কয়েকসপ্তাহ কেটে গেল। কত নিষ্ঠা সহকারে মেরী আর পীরি

দিনের পর দিন খনিজের পর খনিজ পরীক্ষা করে চললেন। স্কুলের সংগ্রহশালা থেকে খনিজ পদার্থের নমুনার পর নমুনা নিয়ে যান, আবার ফিরে আসেন। কিন্তু যথাপূর্বং তথা পরম্। ফলাফলের কোন হেরফের দেখা গেল না। কেবল ইউরেনিয়াম আর থোরিয়াম থেকেই তেজস্ক্রিয়তা দেখা গেল। অন্যান্য সমস্ত মৌলই দেখা গেল নিষ্ক্রিয়, মৃতবৎ।

মাদাম কুরীকে খুব পরিশ্রান্ত আর বিবর্ণ দেখা গেল। ফ্ল্যাটে নিজের শিশুকে একবার দেখে তিনি আগে গবেষণাগারে নিজের টেবিলটিতে ফিরে গেছেন। আবার তিনি আগে অসংখ্য বার যা করেছেন, পিচব্লেণ্ড থেকে ইউরেনিয়াম ধাতু উদ্ধারের কাজে মন দিলেন।

জটিল রাসায়নিক পদ্ধতি শেষ করে ইউরেনিয়াম্ দ্রবনে রাখলেন। অবশিষ্ট অংশে পড়ে থাকল পিচব্লেণ্ডের বাকি আর সব ধাতুর অংশগুলো। এবার তিনি ইউরেনিয়াম দ্রবন থেকে জলটা বাষ্পীভূত করে দিলেন এবং কঠিন অবশিষ্ট অংশটুকু তাঁর রেকাবিতে শুকিয়ে নিলেন। কিন্তু তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপ করতে গিয়ে সম্পূর্ণ আশাতীত এবং ভীষণ ভয়াবহ একটা ঘটনা ঘটল। হঠাৎ দেখা গেল, বিশুদ্ধ অবস্থায় পিচব্লেণ্ড থেকে তিনি যে ইউরেনিয়াম পেয়েছেন, তার থেকে কোন রশ্মি নির্গত হচ্ছে না, বরং যার তেজস্ক্রিয় হওয়ার কথা নয়, রশ্মি নির্গত হচ্ছে সেই পরিত্যক্ত পিচব্লেণ্ডের অবশিষ্ট অংশ থেকে। কী রহস্যপূর্ণ ব্যাপার! এই অবশিষ্ট অংশে নিশ্চয়ই তামা, সীসা, আর্সেনিক নিকেল এবং আরও কয়েকটি দুর্লভ মৌল আছে—পীরি ও মেরীর আগের পরীক্ষানুসারে যারা আদৌ তেজস্ক্রিয় নয়।

মেরী পরীক্ষা করছিলেন। পীরি এমন সময় হঠাৎ গবেষণাগারে এসে ঢুকলেন—হায়! কি হলো, কিছুই বুঝতে পারছি না। মেরী হতাশকণ্ঠে ভেঙে পড়লেন। যতবারই পরীক্ষাটা করছি, ততবারই একই ফল দাঁড়াচ্ছে। প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন মৌলকে পৃথকীকরণ করার সময় কিছু একটা ঘটছে, যার ফলে সমস্ত সিদ্ধান্তই একেবারে ওলোটপালট হয়ে যাচ্ছে। ইউরেনিয়াম মৃত অথচ অবশিষ্টাংশ, যার মধ্যে এক বর্ণও ইউরেনিয়াম নেই, সেটা হঠাৎ তেজস্ক্রিয় হয়ে উঠছে। পরীক্ষার দিক থেকে এর মধ্যে কোন ভুল থাকতে পারে না। আমরা নিশ্চয়ই সব রকম তেজস্ক্রিয় মৌল নিয়ে পরীক্ষা করেছি এবং সন্দেহাতীতভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি যে, মৌলের মধ্যে কেবল ইউরেনিয়াম ও

থোরিয়ামই রশ্মি বিকিরণ করে। অথচ দেখছি, সবই উল্টো—কী অদ্ভুত ভুতুড়ে ব্যাপার!

—এখন এর কি ব্যাখ্যা দেবে? পীরি জিগ্যেস করলেন।

—সম্ভবত এর একটিমাত্র উত্তরই দেওয়া যায়। এই সমস্ত তেজস্ক্রিয় নয় এমন মৌলগুলোর মধ্যে হয়তো এমন কোন মৌল থেকে থাকবে, যা তেজস্ক্রিয় অথচ আমরা যাকে এখনো সনাক্ত করতে পারি নি। উপরন্তু এর তেজস্ক্রিয়-ক্ষমতা এত বেশি যে ওর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশও রশ্মির বিকিরণ ঘটায়, যা আমরা বার বার লক্ষ্য করলাম। পিচব্লেণ্ডের পরিবারের শরিক মৌলগুলোর আণবিক ওজনগুলো যোগ করলেই ওটা সহজে ধরা পড়ে। অথচ একগ্রাম পিচব্লেণ্ডের এক শতাংশ নিয়ে বার বার ওজন করে আমরা লক্ষ্য করেছি, যোগফল একই দাঁড়ায়। ওজনের তো কোন রকম তারতম্য ঘটে নি যে আমরা অনুমান করব, কোন মৌল এখনও ধরা পড়ে নি। অতএব আমাদের নতুন মৌলটি, যদি ওটা আদৌ থেকেও থাকে, তা হলে ওর উপস্থিতি একমাত্র বিকিরণ দিয়েই প্রমাণিত হচ্ছে। ভেবে দেখো পীরি, আমরা নয় কিলোগ্রাম পিচব্লেণ্ড দিয়ে শুরু করেছিলাম। নানা রকম প্রক্রিয়ার পর ওর ওজন এসে দাঁড়ায় মাত্র তিন কিলোগ্রাম। তত্ত্বের দিক থেকে তা হলে বিকিরণের ক্ষমতাও তিন ভাগের এক ভাগ হওয়া উচিত। কিন্তু তা তো হলো না। বরং আমাদের এই তিন কিলোগ্রাম অবশিষ্টের বিকিরণ ক্ষমতা ন' কিলোগ্রাম পিচব্লেণ্ডের চেয়ে অনেক বেশি। এর অর্থ তো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একমাত্র যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে আমরা নতুন কোন মৌল আবিষ্কার করতে চলেছি; বিকীর্ণক মৌল। আমরা যদি সত্যি সত্যিই ওর সন্ধান পাই, পীরি, তাহলে ওর নাম রাখব রেডিয়াম।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সময় মাদাম কুরী বুঝতে পারেন নি যে ঐ বিকীর্ণক মৌল উদ্ধারের জন্য, মাত্র এক গ্রামের দশ ভাগের এক ভাগ শুদ্ধ রেডিয়াম লাভ করার জন্য, কুরী দম্পতিকে প্রায় এক টন পিচব্লেণ্ড আনতে হবে। তখনকার দিনে জোয়েকিম্‌সথল থেকে ওটা আনাতে হতো, শুধু যান-বাহন বাবদই খরচ পড়ত প্রচুর।

আর তাঁদের ছোট গুদাম ঘরে এক টন পিচব্লেণ্ড রাখার মত জায়গা ছিল না। অগত্যা কুরী দম্পতি বিজ্ঞান আকাদেমিকে জানালেন যে ইউরেনিয়ামের

দু'টি যৌগিক—পিচব্লেণ্ড নামক ইউরেনিয়াম অক্সাইড এবং কালকোলিথ নামক কপার ইউরেনিয়াম ফস্‌ফেট—ইউরেনিয়ামের চেয়ে অনেক বেশি তেজস্ক্রিয়। এ থেকে স্পষ্টতই মনে হয় যে উক্ত দু'টি যৌগিকের, মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোন মৌলের সামান্য অংশ অন্তত বিদ্যমান, যা ইউরেনিয়ামের চেয়ে অনেক বেশি তেজস্ক্রিয়। কিন্তু কুরী দম্পতির এই অনুসন্ধান চালানোর উপযোগী কোন ঘরের সংস্থান সেদিন বিজ্ঞান আকাদেমিও করল না। এমন কি ফরাসী সরকারও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলেন।

আবার লোমাণ্ড মার্গের স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন। স্কুলের পশ্চাদ্‌ভাগের একটা কুঁড়ে ঘর তিনি ওদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিলেন। একটা শেড মতন, মাথায় কাচের ছাদ। ছাদটায় আবার অসংখ্য ছিদ্র, বৃষ্টির দিনে হুড়হুড় করে জল পড়ে। অ্যাসফল্টের মেঝে, আসবাবপত্র বলতে কয়েকটা ভাঙাচোরা চেয়ার, একটা মরচে ধরা নলওলা পুরানো লোহার ষ্টোভ আর একটা পরিত্যক্ত ব্ল্যাকবোর্ড।

এই চরম অব্যবস্থার মধ্যে কুরী দম্পতিকে এক টন জোয়েকিম্‌সথলের অবশিষ্ট থেকে একটি রাসায়নিক মৌল উদ্ধারের কাজে আত্মনিমগ্ন করতে হলো। ঐ মৌল আবিষ্কারের পর দেখা গেল, মৌলটি পিচব্লেণ্ডের তিরিশ লক্ষ ভাগে মাত্র এক ভাগ থাকে।

পিচব্লেণ্ডের পদার্থগুলো আরও নির্ভুলভাবে পৃথক করার পর তাঁরা পর্যবেক্ষণ করলেন যে, তেজস্ক্রিয়তা কেন্দ্রীভূত হয়েছে, কিন্তু একটি নয় দু'টি বিভিন্ন পদার্থে—একটি বেরিয়াম দিয়ে তৈরি আর অপরটি বিসমাথ দিয়ে। অতএব পিচব্লেণ্ডে একটি মাত্র তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে, এ-অনুমান আর টিঁকল না। যেহেতু পরীক্ষার পর পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্ত দৃঢ় হলো যে রেডিয়াম বেরিয়ামের সঙ্গে যুক্ত, অতএব মাদাম কুরী অনুমান করলেন, অপর কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ বিসমাথের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। দেশমাতৃকার প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন হিসেবে তিনি ওর নাম রাখলেন 'পোলোনিয়াম'। পোল্যাণ্ড থেকে পোলোনিয়াম।

দুই কুরী এবার যৌথভাবে লেগে গেলেন রাসায়নিক পদ্ধতিতে রেডিয়াম ও পোলোনিয়াম পৃথক করার কাজে। বাইরের উঠানের কায়িক পরিশ্রমের বেশির ভাগই মেরীকে করতে হতো। আর পীরি ঘরে বসে

রাসায়নিক পরীক্ষার কাজ করতে থাকলেন। তবুও মেরী সময় খুঁজে নিলেন নিজের সাধারণ হলুদ বর্ণের ডায়েরিতে কিছু হৃদয়স্পর্শী বিবরণ লিখে রাখার জন্যে :

আমাদের অর্থ নেই, প্রয়োগশালা নেই, কোন রকম সাহায্য পর্যন্ত নেই, এই সুকঠিন গুরুত্বপূর্ণ কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে। এ যেন হাওয়া থেকে হীরে তৈরি করবার মত। অথচ কোন রকম অতিশয়োক্তি না করেও আমি বলতে পারি যে এ-যুগটিই ছিল আমার ও আমার পতির যৌথ জীবনের সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ যোগ। এই জরাজীর্ণ শেডের মধ্যে প্রাণ ঢেলে আমরা কাজ করতে থাকি। দারিদ্র্য পীড়িত হয়েও পরম সুখের মধ্যে দিয়েই অতিবাহিত হতে থাকে আমাদের একটার পর একটা বছর। কোন কোন দিন শেডের মধ্যে রেঁধে-বেড়ে নিতে হয়, কারণ সামান্যতম কাজেও কোন রকম বাধা আসুক, এটা আমরা চাইতাম না। কোন কোন সময় আমার প্রায় সমান লম্বা একটা লোহার রড নিয়ে থক্‌থকে গলিতে পিচব্লেণ্ডের ঘোলটা ঘাঁটতে হতো। রাত্রে ক্লান্তিতে অবসাদে ঢলে পড়তুম।···

এইভাবে একে একে চার বছর পার হয়ে গেল। ঠিক মত হিসেব করলে পঁয়তাল্লিশ মাস। এ দীর্ঘ সময় মাদাম কুরী প্রতিদিন এমনকি বেশ কয়েকটি রাত্রি রেডিয়াম বিশুদ্ধিকরণের কাজে ব্যয় করেন। পৃথক করার চেষ্টা করেন। অনেক সময় ওঁর স্বামী হাল ছেড়ে দিতেন। কিন্তু মাদাম কুরীর যেন ধনুক ভাঙা পণ, হার-না-মানা একনিষ্ঠতা। বারংবার তিনি স্বামীকে উৎসাহিত করেন: নিরাশ হলে চলবে না, চালিয়ে যাও। শেডের প্রত্যেকটি টেবিল কৌটো বাটায় ভরা, প্রত্যেকটিতে রেডিয়ামের দ্রবণ। কিন্তু শেডের বাতাস এত বেশি ধুলো-বালিতে ভরা থাকতো যে অবিশ্বাস্য ধৈর্যসহকারে প্রস্তুত ঐ বিশুদ্ধ দ্রবণ বার বার দূষিত হয়ে পড়ত। মাদাম কুরীর ধৈর্য তবুও অনড় অচল, পর্বতের মত অটল। তিনি বার বার ঐ সব দ্রবণের স্ফটিকিকরণের, অবক্ষেপণের ও বিভাজনের কাজ নিয়ে লেগে যান। ওদের বিশুদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার না করা পর্যন্ত যেন ওনার ছুটি নেই। তিনি প্রথমে তাঁর বেরিয়াম ও রেডিয়াম ক্লোরাইডের মিশ্রণকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে পৃথক করতে গিয়ে বিফল হলেন। পরে অবশ্য অ্যালকোহল দিয়ে পৃথক করেন। অবশেষে তিনি তাঁর পাত্রে এক গ্রামের দশ ভাগের এক ভাগ

পরিমাণ রাসায়নিক দিক থেকে বিশুদ্ধ রেডিয়াম ক্লোরাইড পেলেন। রেডিয়াম ধাতুর আণবিক ওজন দাঁড়াল দুইশত পঁচিশ এবং দেখা গেল এর বিকিরণ ক্ষমতা ইউরেনিয়ামের প্রায় তিরিশ লক্ষ গুণ।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মাদাম কুরী গভীর রাত্রে তাঁদের সদ্য ঠিক করা বুলবার্ড কেলরমানের নতুন ফ্ল্যাটে ফিরে আসেন। ক্লান্তিতে অবসাদে টলতে টলতে যখন তিনি উঠানের ওপর দিয়ে চলতে থাকেন তখন একটা চিন্তাই তাঁর কেবল ঘুরে ফিরে মরে ঃ কেমন দেখতে হবে তাঁর এই 'রেডিয়াম'!

মেয়ে আইরিনকে তিনি পরম স্নেহে নিজের বিছানায় শুইয়ে দেন। তার পাশে বসে থাকেন, যতক্ষণ না চার বছরের মেয়ে তাঁর কানে 'মা, মা' বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু মাদাম কুরীর মাথায় কেবলই ঐ এক চিন্তা— রেডিয়াম! রেডিয়াম!

মধ্যরাত্রিতে মেরী কুরী বিছানায় উঠে বসেন।

— পীরি, তুমি কি ঘুমিয়ে?

— না।

— আমরা যদি একটু ঘুরে আসি।

মেরী কি বলতে চান, তা আর জিগ্যেস করলেন না পীরি। তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। লোমাণ্ডের প্রয়োগশালায় সেই রেডিয়াম ক্লোরাইডের বোতলটার কথা তাঁরও মাথায় ঘুরছে।

দু'জনেরই সারাদিন দারুণ পরিশ্রম গেছে। তবু তাঁরা উঠে বসলেন, পোষাক পরলেন এবং যেন এক সাধারণ নেশার ঘোরে হাত ধরাধরি করে নীরব নিস্তব্ধ রাত্রির রাস্তা দিয়ে হেঁটে চললেন প্রয়োগশালার দিকে। যেন রেডিয়াম কোন দুজ্ঞেয় রহস্যের সংবাদ নিয়ে তাঁদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

শেডের দরজাটা ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল, পীরি যখন চাবি দিয়ে ওটা খুললেন।

— আলো জ্বেলো না, মেরী ফিস ফিস করে উঠলেন। খুব সাবধানে সন্তর্পণে গুণে গুণে পা ফেলে তাঁরা ঘরে ঢুকলেন। একটা নীল সবুজ আলোকের প্রতিদীপ্তি টেবিল থেকে তাঁদের দিকে আসছে।

— তোমার মনে পড়ছে মেরী, পীরি আস্তে আস্তে বললেন, তোমার বড় আশা ছিল, রেডিয়ামের রং না জানি কত সুন্দর! কি, এখন খুশি তো?

— দেখো, দেখো, একবার ভাল করে চেয়ে দেখো— মেরী উচ্চারণ করলেন।

অনেকক্ষণ ধরে পরস্পরের বাহুসংলগ্ন হয়ে তাঁরা চেয়ে রইলেন তাঁদেরই প্রজ্জ্বলিত ঐ নীল সবুজ আলোকের দিকে।

মেরী কুরী যখন প্যারিসে রেডিয়ামের সরল রাসায়নিক যোগিকের বিশুদ্ধ নমুনা প্রস্তুতে ব্যস্ত, অধ্যাপক উইলিয়ম রামসে এবং তাঁর নতুন সহকারী ফ্রেডেরিক সোডি তখন লণ্ডনে পঞ্চাশ মিলিগ্রাম রেডিয়াম ব্রোমাইড নিয়ে পরীক্ষা করছেন।

কয়েক বছর হলো রামসে প্যারিসে বেকরেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর রশ্মি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভও করেন। তারপর তিনি লণ্ডনে ফিরে গিয়ে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে দেন। কিন্তু এই প্রথম তিনি একেবারে নতুন একটা গ্যাসের কথা শুনলেন। আরও শুনলেন, ওর সম্বন্ধে অদ্ভুত সব বিবরণ। শুধু বেকরেলের কাছ থেকে নয়, বিবরণ তিনি পেলেন মেরী কুরীর কাছ থেকে আর খুব মেধাবী সহকর্মী আর্নেষ্ট রাদারফোর্ডের কাছ থেকে।

বেকরেল এবং কুরী দম্পতি এই পরম বিস্ময়কর আবিষ্কার করে বসলেন। যে রেডিয়াম-আশ্রিত পদার্থগুলো রহস্যপূর্ণ 'কিছু একটা' দেয়, যা তার প্রতিবেশী সব কিছুকেই অনুরূপভাবে তেজস্ক্রিয় কার তোলে। যার ফলে, ঐ সব পদার্থও রশ্মি বিকিরণ করে। ধাতু, কাচ-জাত দ্রব্যসামগ্রী এমন কি কাগজের টুকরোও এই প্রকৃতি তুলে ধরে: যেন তাদের আশেপাশে তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা সংক্রামিত হয়েছে এবং তার ফলে তারা নিজেরাও সাময়িকভাবে তেজস্ক্রিয় হয়ে উঠছে।

মেরী কুরী এই ব্যবহারের নামকরণ করেন 'আবিষ্ট তেজস্ক্রিয়তা'। কিন্তু বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন পদার্থবিদ্ ও গবেষক আর্নেষ্ট রাদারফোর্ড অত সহজে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি বার বার রেডিয়াম মিশ্রিত পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন এবং আবিষ্কার করে বসলেন যে অন্যান্য পদার্থের যখন তেজস্ক্রিয় পদার্থদের সঙ্গে বায়ুশূন্য স্থানে আনা হয়, তখন ঐ সংক্রমণ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ওরা আর তেজস্ক্রিয় পদার্থ হয়ে ওঠে না।

সাধারণ-ভাবে যে তেজস্ক্রিয়তা একটি পদার্থ থেকে অপর একটি পদার্থে সংক্রামিত হয়, তাকে বাতাসের মতই কাচের আধার থেকে বার করে দেওয়া যায়। ব্যাপারটা এই বোঝায় যে 'রহস্যপূর্ণ কিছু' যা তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত হয়, তা আসলে একটা গ্যাস ছাড়া আর কিছু নয়।

বাস্তবিক পক্ষে, মাদাম কুরীর মনেও অমনই একটা সন্দেহের মেঘ কিছুদিন যাবৎ উঁকি দিচ্ছিল। বেশি কথা কি, মাদাম কুরী রেডিয়াম থেকে নির্গত এই 'বিকিরণ' কাচের নলে সংগ্রহ করে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। যখনই তিনি বেকরেলের কাছ থেকে জানলেন যে রেডিয়াম-রশ্মি গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক প্রভাব বিস্তার করে, এই রশ্মি কেবল শাকসব্জীর অঙ্কুর উদ্গমেই বাধা দেয় না, তারা মানবদেহের চর্মের ওপরও মারাত্মক ক্রিয়া করে, মাদাম কুরী তৎক্ষণাৎ তাঁর নলে সংগৃহীত তেজস্ক্রিয় গ্যাস প্যারীস হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, চিকিৎসাবিদ্‌দের পরখ করে দেখতে হবে, এই তেজস্ক্রিয় গ্যাস চর্মের রোগ সারাতে পারে কি না, এমন কি বিষাক্ত টিউমার সারাতে পারে কি না।

ইতিমধ্যে মন্ট্রিয়েলের মেকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্নেষ্ট রাদারফোড এবং তাঁর সহকর্মী ফ্রেডেরিক সোডি বিকিরণ নীল পদার্থ থেকে নির্গত গ্যাসের ওপর পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছিলেন। তাঁরা দেখলেন, ঐ গ্যাস সমস্ত রকম রাসায়নিক ক্রিয়া প্রতিহত করে। সুতরাং ওটা একপ্রকার নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিসেবে গণ্য করা যায়। বিশেষ করে এই গ্যাস নিষ্ক্রিয় গ্যাসের শ্রেণীর শেষে থাকায় এবং ওর আণবিক ওজন দু'শত বাইশ হওয়ায়। রেডিয়াম-যুক্ত পদার্থগুলো থেকে ঐ গ্যাস নির্গত হচ্ছে বলে রাদারফোর্ড ওর নাম রাখলেন 'নির্গমন'।

কিন্তু নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ওপর জীবিত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে লণ্ডনের অধ্যাপক উইলিয়ম র‍্যামসে ছিলেন অগ্রগণ্য। র‍্যামসে ইতিমধ্যেই এইসব বিরল গ্যাসীয় মৌলের একটি শ্রেণী অনুসন্ধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতএব রাদারফোর্ড এবার বিশেষ যত্নসহকারে পঞ্চাশ মিলিগ্রাম রেডিয়াম ব্রোমাইড কাচের শিশিতে সংরক্ষিত করে তাঁর তরুণ শিষ্য সোডির কাছ দিয়ে তাঁকে অতলান্তিকের ওপারে পাঠালেন র‍্যামসের কাছে। র‍্যামসেকে তিনি বিশেষ-ভাবে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন তাঁর প্রেরিত এই নতুন গ্যাসটি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখেন।

অধ্যাপক র‍্যামসে সোডিকে অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং আর কালক্ষেপ না করে দুই পদার্থবিদ্ হাতের সমস্যাটি নিয়ে উঠে পড়ে পরীক্ষা শুরু করে দেন। কিন্তু মাত্র পঞ্চাশ মিলিগ্রাম রেডিয়াম ব্রোমাইডের জলীয়

অংশ থেকে কতটুকুই বা নির্গমন সম্ভব? তার অকিঞ্চিৎকর নির্গমনকে সাধারণ যন্ত্রপাতি দিয়ে দেখাই বা যায় কি করে? অগত্যা ঐ দুই পদার্থবিদ্‌কে আগেই প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি করে নিতে হলো। যন্ত্রপাতির আকার এত ছোট হলো যেন লিলিপুটদের রাসায়নিক উপকরণ। তারপর তাঁরা রেডিয়াম ব্রোমাইড থেকে নির্গত রশ্মি ধরার জন্য একটা ছোট্ট কাচের টিউব তৈরি করলেন। পরে এই কাচের টিউবটি, যার মধ্যের দেওয়াল দিয়ে ধনাত্মক বিদ্যুৎ দণ্ড গেছে, একেবারে 'সীল' করে দেওয়া হলো। টিউবের এক দেওয়াল থেকে আর এক দেওয়ালে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ পারাপার এই ভাবে সম্ভব হয়ে উঠল। নতুন গ্যাসের বর্ণালী বিশ্লেষণের আর কোন অসুবিধা রইল না।

দীর্ঘ এবং বিশেষ বিচক্ষণতা প্রসূত ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে র‍্যামসে এবং সোডি এবার রেডিয়াম ব্রোমাইড থেকে নির্গত অন্যান্য সমস্ত গ্যাস থেকে 'নির্গমন'কে আলাদা করে ফেলতে সক্ষম হলেন। অবশ্য ঐই নির্গমনের পরিমাণ এক ঘন সেন্টিমিটারের চল্লিশভাগের এক ভাগ মাত্র। কিন্তু এই অতি সামান্য পরিমাণ নির্গমনই ঐ গ্যাসের বর্ণালী বিশ্লেষণের জন্যে তাঁদের কাছে যথেষ্ট ছিল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল দেখে সন্তুষ্ট হয়ে এবার এই দুই বিজ্ঞানী কাচের টিউবকে একটু তফাতে সরিয়ে রাখলেন।

কয়েকদিন পরে অধ্যাপক র‍্যামসে নির্গমন বর্ণালীর প্রতি আর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। এক মুহূর্ত পরে তাঁর মনে সন্দেহের মেঘ ঘনিয়ে এল —র‍্যামসে নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। বিস্মিত, স্তম্ভিত র‍্যামসে। বর্ণালীটা পাল্টে গেছে। কয়েকদিন আগে তিনি ও সোডি যা দেখেছিলেন, বর্তমান বর্ণালীর সঙ্গে তার কোন মিল নেই। কয়েক বছর আগে ভারতবর্ষে গ্রহণের সময় জানসেন সৌর বর্ণালীতে যেখানে হলুদ ডি-৩ রেখাটি দেখেছিলেন, ঠিক সেখানেই ওঁরা এবার একটা নিষ্প্রভ হলুদ দীপ্তি লক্ষ্য করলেন।

—এ অসম্ভব, অসম্ভব, তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে তাঁর সহকারীকে জানালেন। রেডিয়াম ব্রোমাইড যে গ্যাস নির্গত করেছিল, তুমি নিজেই তো ক'দিন আগে তা তোমার ক্ষুদে টিউবে পরীক্ষা করে দেখেছিলে। তখন কি তুমি ওর বর্ণালীতে হলুদ বর্ণের এই দীপ্তি লক্ষ্য করেছিলে?

—না, স্যর। হলুদ কোন ছোঁয়াই ওর মধ্যে ছিল না।

— এবং তারপর তুমি আর এ পর্যন্ত ঐ টিউবটি স্পর্শ করো নি ?

— নিশ্চয়ই না। ওটা ব্যবহারের কোন প্রয়োজনই দেখা দেয় নি।

— আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ঐ হলুদ দীপ্তি হীলিয়ামের উপস্থিতি সূচিত করে। কিন্তু পৃথিবীতে ঐ টিউবের মধ্যে হীলিযাম আসবে কোত্থেকে ?

অনেকক্ষণ ধরে তাঁরা এ-ধাঁধাটা নিয়ে মাথা ঘামালেন, অনেক চিন্তা-ভাবনা, আলোচনা করলেন। কিন্তু কোন সদুত্তর পাওয়া গেল না।

পরের দিন সকালে কিন্তু, ঐ হলুদ রেখাটা আরও বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং পরবর্তী কয়েক দিনে হীলিয়ামের অন্য আরও বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠল। সবশেষে ঐ ছোট্ট টিউবের গ্যাসের বর্ণালী, দেখা গেল, পুরোপুরি হীলিয়ামেরই বর্ণালী। অতএব অন্য কোন স্থান থেকে না এসে পড়লে, হীলিয়াম, বোঝা গেল, বিরল-গ্যাসের নির্গমনে অবস্থান করে। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব ?

ব্রিটিশ বিজ্ঞানী দু'জন বার বার তাঁদের পরীক্ষা চালালেন। কিন্তু আগের মতই হীলিয়ানের কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না। কেবল কয়েকদিন পরে বিদ্যুৎ প্রেরণ টিউবে ওটা দেখানো গেল— প্রথমে খুব ক্ষীণ ভাবে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট, আরও স্পষ্ট, আরও স্পষ্ট ভাবে। শেষে ওর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ডি-৩ রেখা হলুদ রেখায় নির্ভুলভাবে ধরা পড়ল। কিন্তু কোত্থেকে এলো এই হীলিয়াম ?

এসো আমরা আরও শান্ত মস্তিষ্কে ওর পরীক্ষাটা চালিয়ে দেখি। র‍্যামসে প্রস্তাব দিলেন। যেহেতু শুরুতে নির্গমনে হীলিয়ামের চিহ্নমাত্র ছিল না, এবং যেহেতু হীলিয়াম ধীরে ধীরে আমাদের বিদ্যুৎ প্রেরণ টিউবে দেখা গেল, অতএব বোঝা গেল নির্গমনই হীলিয়ামে রূপান্তরিত হয়েছে। এবং এই রূপান্তর আপনা আপনিই সজ্ঘটিত হয়। এটা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম।

কিন্তু এটা একটা অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য ব্যাপার।— সোডি আমতা আমতা করে বললেন। নির্গমন ক্রমে বিচ্ছেদনে কিছু সময়ের ব্যবধানে হীলিয়ামে রূপান্তরিত হয়, এই ঘটনা থেকে আমরা কী সিদ্ধান্তে আসতে পারি ?

আমার মাথায় একটা নতুন ধারণা ঢুকিয়ে দিলে, সোডি— তোমার ঐ 'বিচ্ছেদন' শব্দের ব্যবহার। অতএব ধারণা করা যায় যে রেডিয়ামের মত উচ্চ আণবিক ওজনের অণু প্রাকৃতিক গঠন অনুসারেই অস্থায়ী। তারা ভেঙে যায় এবং ঐ ভাঙার সময় অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়, যারা

আবার অস্থায়ী, অথবা মাদাম কুরীর ভাষায় 'তেজস্ক্রিয়'। বোধ হয় এই তেজস্ক্রিয়তা চলতেই থাকে যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত স্থিতিশীলতায় পৌঁছায়। স্থিতিশীলতায় পৌঁছে গেলে আমাদের পদার্থ আবার স্থায়ী পদার্থে ফিরে আসে।

কিছুক্ষণ প্রয়োগশালায় অসহনীয় এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল।

তারপর র‍্যামসে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন— মনে কর রেডিয়াম নিজেই নির্গমন করতে করতে অন্য এক পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে গেল, তা হলে আরও অনেক কিছু দেখার আছে, সোডি। আমরা এখন আর কোন ভারী মৌলকে মূলত পদার্থের আসল রূপ হিসেবে গণ্য করতে পারি না, কারণ পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, নির্গমনের দ্বারা পদার্থ ক্রমাগত অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়! আচ্ছা, তোমার কি মনে হচ্ছে না, এটা একটা বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্ত। মনুষ্যজাতি যুগ যুগান্তর ধরে বৃথাই যার অনুসন্ধান করছিল, আমরা সেই দুর্লভ বস্তুটি হঠাৎ হাতের নাগালের মধ্যে পেয়ে গেছি। মৌলের রূপান্তর এখন আর আজগুবি কল্পনা নয়, বাস্তব ঘটনা। আমরা সেই বিশেষ প্রক্রিয়াটাই লক্ষ্য করলাম, এতদিন যার ফলে একটি মৌল অন্য এক মৌলে রূপান্তরিত হয়ে যায় আর যার জন্যে সকল রসায়নবিদেরা এতদিন ধরে সর্বপ্রকার চেষ্টা করেও সফলকাম হননি। এ কথা ঠিক সোডি, আমরা কোন সস্তা ধাতুকে এখনো স্বর্ণে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হইনি বটে, কিন্তু বাদামী ধূসর রেডিয়াম ব্রোমাইড থেকে সৌর পদার্থ হীলিয়ম আবিষ্কার কি কিছু কম রোমাঞ্চকর।

নক্ষত্রলোক থেকে বেতার তরঙ্গ

১৯৩১ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে মস্ত এক অট্টালিকার ওপরের তলায় এক ভদ্রলোক তাঁর বেতার-গ্রাহক যন্ত্রের কাছে বসেছিলেন। ভদ্রলোকের নাম কার্ল জে. জ্যাংস্কী। তাঁর চৌদ্দ বছরের প্রাণবান ছেলে বিল তখন সবে স্কুল থেকে ছুটিতে বাড়ি ফিরেছে। সে বাবার পাশে পাশে থেকে প্রতিটি মিনিট বাবা কি ভাবে ঐ রেডিও সেটের নব'গুলো ঘোরাচ্ছেন, তাই লক্ষ্য করছে। 'বাবা কি করেন' কেউ জিগ্যেস করলে বিল উত্তর দেয়—বাবা রেডিও'র কাজকর্ম করেন। তার বাবা যে প্রসিদ্ধ বেল কোম্পানীর রেডিও ইঞ্জিনিয়ার, এটা তার বিশেষ মঃনপুত নয়।

এক দিক থেকে বিল বোধ হয় ঠিকই অনুমান করেছিল। তার বাবার বিশেষ উৎসাহ ছিল নতুন নতুন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বেতার-গ্রাহক যন্ত্র তৈরী করা, বেতার গ্রহণ-প্রেরণ সমস্যার উন্নতি বিধান করা এবং ইথার থেকে আগত বেতার-সঙ্কেত কান পেতে শোনা। জ্যাংস্কীর মালিকেরাও সর্বপ্রকারে তাঁকে এই কাজে উৎসাহ দিতেন। তাঁরা ছুটির সময়টুকুর জন্যে তাঁকে একটা আধা-সরকারী কাজও দিয়ে রেখেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন, উনি ওনার রেডিও হেমের কাজের পরিপূরক সমস্ত রকম পর্যবেক্ষণ ইতিমধ্যে সেরে ফেলেন। কিন্তু এ-কাজে শ্রীমতি জ্যাংস্কী মোটেই সন্তুষ্ট হন নি। কারণ, এর অর্থ গ্রামে না গিয়ে পুরো জুলাই মাসের রৌদ্র-দহনটা শহরে বসে পোহানো। কিন্তু বিল দৃঢ়ভাবে তাঁর বাবার পক্ষ নেওয়ায় অগত্যা শ্রীমতি জ্যাংস্কীকে পুরুষদের কাছে নতি স্বীকার করতে হলো।

একদিন বিল তার বাবার পড়ার ঘরে ঢুকে চিৎকার করে উঠল—বাবা, বাবা, ভীষণ ঝড়-জল আসছে।

এক দিক থেকে ব্যাপারটা অন্যদের কাছে পাগলের প্রলাপ বলে মনে হবে। অন্যান্য আর সকলের কাছে, বিশেষ করে এই ছুটির সময়, বজ্র মেঘের এই ঘনঘটা ভয় ও বিরক্তির কারণ, অথচ এরা বাপ-বেটায় আনন্দে নেচে উঠল।

— খুব ভালো কথা, সানন্দে বাবা ঘোষণা করলেন। এসো, এখন আমরা শুরু করি।

এক সপ্তাহ ধরে তারা বৃথাই এমন একটা কালবৈশাখীর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। কারণ তাঁর কোম্পানি জ্যাংস্কীকে বজ্র-মেঘের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পর্যবেক্ষণের কাজটি দিয়েছিল।

তিনি বেতার-গ্রাহক যন্ত্রের পাশে গিয়ে বসলেন, নব'গুলো ঘোরাতে আরম্ভ করলেন। নির্দেশক এরিয়েলটিকে নিচের মেঘগুলোর দিকে সরাসরি তুলে ধরলেন। বিল গভীর প্রত্যাশায় তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে— তুমি কি করতে চাইছ, বাবা ?

কিন্তু কার্ল জে. জ্যাংস্কী নিজেও ঠিক জানেন না, তিনি তাঁর ঐ পঞ্চাশ ফুট উচ্চ নির্দেশক এরিয়েলটি দিয়ে কি করতে যাচ্ছেন।

— বেতার শ্রোতাদের কান ঝালাপালা করা এই নেপথ্য শব্দগুলোর ব্যাপারে কি করা যায়, কোম্পানি তা জানতে চায়। তুমি কি জানো না যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বেতার সংগ্রহণের ক্ষেত্রে ভীষণভাবে বিরক্তিকর বাধার সৃষ্টি করে ? বায়ুমণ্ডলে তড়িৎপ্রবাহের ক্ষেত্রেও বিশেষ করে বজ্র-ঝড়ের সময় ঐ একই জিনিস ঘটে। ওরা চায়, ঐ ব্যাপারটা আমি আরও ভালোভাবে অনুসন্ধান করি। আর সেই জন্যেই আমরা এতক্ষণ ঝড়ের প্রতীক্ষা করছিলাম। এক মিনিট— ওরা এসে গেছে…

লাউড-স্পীকার থেকে ভয়ঙ্কর আওয়াজ আসছে— কখনো কান-ঝালাপালা করা, কখনো বাঁশির মত, কখনো যেন কে জোরে শিশ দিচ্ছে— সব মিলিয়ে যেন শত শত বেড়ালের ল্যাজ মোচড় দেওয়ার ফলে একটা ভীষণ চিৎকার !

শ্রীমতি জ্যাংস্কী এসে দেখলেন, বাপ-বেটা নিজেদের কাজে বিশেষ তন্ময়।

— তা হলে বুঝতে পারছ বিল, ঐ আওয়াজটা তোমায় কোনরকমে দাবিয়ে রাখতে হবে।

— কিন্তু কোত্থেকে আসছে ঐ আওয়াজ ? বিল জিগ্যেস করল।

— ওটা নিশ্চয়ই তড়িতাহত বজ্র মেঘ থেকেই আসছে।

জ্যাংস্কী কিছুক্ষণ ধরে তাঁর ঐ এরিয়ালটা আকাশের এদিকে একবার, অন্য দিকে আরেকবার ঘোরাতে লাগলেন। কিন্তু রেডিও সেটে আগত ঐ আওয়াজটা এখন যেন ওঁর নিজের কাছেও বেশ বিরক্তিকর লাগছে। তিনি

সেট-টা বন্ধ করে দিলেন।—আজকের মত এই পর্যন্ত বিল, তিনি বললেন। ঠিক সেই মুহূর্তে এক ঝলক বিদ্যুৎ সীসের মত আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে চমকে উঠল।

পরের দিন, প্রায় সেই সময় বিল তার বাবার পড়ার ঘরে গিয়ে বেতার-গ্রাহক যন্ত্রটা আবার খুলে দিল। কোন বিশেষ কারণে নয়, শুধু ওটা ওকে ধরতে দেওয়া হতো না, তাই। জানালা দিয়ে উন্মুক্ত আকাশের দিকে যতদূর চোখ যায়, মেঘের কোন চিহ্নমাত্র নেই, ঝড়ের কোন সঙ্কেত নেই।

হঠাৎ লাউড-স্পীকারে আগের দিনের সেই কর্কশধ্বনি আবার বাজল।

বিল বাবার কাছে ছুটে গেল-- বাবা, শীগ্‌গির একবার এসো। রেডিও সেট-টার সুইচ খুলে দিয়েছিলাম বলে আমার ওপর রাগ করো না যেন। আজ তো বাতাসে বিদ্যুৎ প্রবাহ নেই, কিন্তু আমরা সেই একই কান-ঝালাপালা করা শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

জাংস্কী অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ছেলেটা ঠিকই বলেছে। বাধাটা কোত্থেকে আসছে, বাধার কোন উৎসই তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এরিয়ালটা আকাশের যে দিকে ঘোরানো ছিল জাংস্কী মনে মনে সেই জায়গাটা স্থির করে রাখলেন। তারপর সেট-টার সুইচ বন্ধ করে দিলেন।

মধ্যাহ্নভোজের পর যখন তিনি রেডিও সেট-টা আবার চালু করে দিলেন তখন সব শান্ত হয়ে গেছে। সমস্ত শব্দ অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

কিন্তু পরের দিন, ঠিক তেইশ ঘণ্টা ছাপ্পান্ন মিনিট পরে, আবার বাতাসে সেই কান-ঝালাপালা-করা শব্দ শোনা গেল। কারণ পৃথিবীর নিজের অক্ষের ওপর একবার ঘুরে আসতে ঐ সময়ই লাগে।

বিল কিন্তু এ-ব্যাপারে বাবার চেয়েও যেন বেশি উত্তেজিত।— বাবা, ব্যাপারটা কি? এ রকম কেন ঘটল, বলো তো?

জাংস্কী যেন ধ্যানস্থ অবস্থায় বলে উঠলেন— প্রথমে আমার বেতার-গ্রাহক যন্ত্রটিকে ধন্যবাদ দিতে হয়। যে আওয়াজ আসছে ওটা থেকে, সেটা ঠিক কর্কশ আওয়াজ নয়, অন্তত আমার কানে তো স্বর্গীয় সঙ্গীতের মতই লাগছে। বিল, আমার পাশে এসে বসো, ধাঁধাটা দু'জনে মিলে সমাধান করি। প্রথমত ভাবার চেষ্টা করো, রশ্মি ও তরঙ্গ সম্বন্ধে স্কুলে কি শিখেছ আর আমি বা তোমাকে কি কি শিখিয়েছি। কত রকম রশ্মি আছে।

— সবার আগে আলোকের কথাই ধরা যাক।

— সবার আগে কেন? যার একপ্রান্তে সবচেয়ে কম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ও সবচেয়ে বেশী কম্পনাঙ্কের মহাজাগতিক রশ্মি এবং যার অপর প্রান্তে সবচেয়ে কম কম্পনাঙ্কের দীর্ঘ বেতার-তরঙ্গ, সেই আলোক-রশ্মিকে সবচেয়ে আগে বেছে নেবার কারণ কি?

— কারণ আলোক-রশ্মি আমরা দেখতে পাই। অন্য সব রশ্মি ও তরঙ্গ আমাদের চোখের অগোচর। আমাদের শিক্ষক মশাই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে দৃশ্যমান আলোকের ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি অনেকটা ছোট জানালার মত যার মাধ্যমে আমরা দীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি দেখতে পারি, যা সাধারণত আমাদের চোখের আড়ালে রয়েছে। আমাদের এই জানালার বাঁ দিকে রয়েছে অদৃশ্য বেগুনি পারের আলো (Ultra-violet light) আর ডান দিকে লাল উজানি তাপ রশ্মি (Infra-red light)। দেখতে না পেলেও আমরা তাদের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি। আরও ডান দিকে আমরা আমাদের বড় পছন্দের রশ্মিগুলো পাই— বেতার তরঙ্গগুলো— ছোট, বড়, মাঝারি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যজনক জিনিস লাগে আমার কাছে ঐ রামধনু— অর্থাৎ ঐ রঙিন সৌরবর্ণালী— যার শেষের একপ্রান্তে বেগুনি আর অপরপ্রান্তে লাল উজানি আলোক রশ্মির বিচ্ছুরণ। প্রকৃতপক্ষে আলোকমালার যেন শেষ নেই। বেগুনির পরে অতি বেগুনি, যেমন লালের পর অতি-লাল।

— আর এটা তোমার কাছে এত আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে কেন? এর অর্থ তো আমাদের মনুষ্যচোখ এমনভাবে তৈরী যে, সকল দৃশ্যমান আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যই আমাদের চোখে ধরা পড়ে।

কিছুক্ষণ ধরে বিল গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। তারপর সে বলে উঠল— যেহেতু আলোক রশ্মি, তাপ রশ্মি এবং বেতার-তরঙ্গ সকলেই বিরাট বিকিরণ বর্ণালীর মধ্যে রয়েছে - যেহেতু এরা সকলেই বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তড়িৎচুম্বক তরঙ্গ— দেখা ও শোনার মধ্যে পার্থক্যটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ঠিক কথা। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বেতার-তরঙ্গ অর্থাৎ দীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তড়িৎ-চুম্বকীয় দোলন আমাদের চোখে ধরা দেয় না কিন্তু সঙ্গীত বা কথার মাধ্যমে বেতারে আমাদের কানে পৌছয়। অবশ্য আমরা নিশ্চয়ই বেতার-তরঙ্গগুলো শুনি না: তারা কেবল সেই সব সঙ্কেত বা

সহায়তা করে। দৃশ্যমান আলোক তড়িৎ-চুম্বকীয় দোলনের সমগ্র তরঙ্গ-লোকের অতি অল্প অংশই প্রকাশ করে। অতএব আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত নয়, এমন তরঙ্গের হদিশ পেতে হলে আমাদের সব রকম কলা-কৌশলের সাহায্য নিতে হবে। বেতার-তরঙ্গের ক্ষেত্রে আমরা বেতার গ্রাহক-যন্ত্রের সাহায্য নিই। বেতার গ্রাহক-যন্ত্র আগমনশীল (incoming) সঙ্কেতগুলো ধরে নেয় এবং এদের শব্দতরঙ্গে রূপান্তরিত করে। কিন্তু তুমি তখন দেখা ও শোনার ওপর একটা বুদ্ধি দীপ্ত মন্তব্য করে বসেছ এবং ওটা আমাকে একটা বলিষ্ঠ ধারণার সামনে এনে ফেলেছ। আমি ভাবছি, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আমরা কি চোখ আর কান দিয়েই পরীক্ষা করতে পারি না !

চলো, তোমার শিক্ষকের কাছ থেকে শোনা ঐ আলোকের জানালার ধারণাটার কাছে আমরা কিছুক্ষণের জন্যে ফিরে যাই। তুমি নিশ্চয়ই জানো, আমাদের এই গ্রহে যে আলোক-রশ্মি এসে পৌঁছায় এবং যা আমরা আমাদের চোখ অথবা আমাদের মানমন্দিরের অসীম অনুভূতিসম্পন্ন দৈত্যাকার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করি, তাই বহিরাকাশ থেকে আগত এই গ্রহের একমাত্র আলোকের দূত। ঐ আলোক-রশ্মিই বর্ণালী বিশ্লেষণের সাহায্যে নক্ষত্রদের আকার, গঠন, তাপমাত্রা এবং গতিবিধি সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকিবহাল করে তোলে। এখন ঐ আলোক-রশ্মিও আসে যেন অনুরূপ একটা জানালার মধ্য দিয়ে। আমাদের পৃথিবীকে ঘিরে যে বায়ুমণ্ডলের ঘেরাটোপ, তারই এক জায়গায় ঐ জানালাটা উন্মুক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর ওটা কেবল নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণকে ওর মধ্য দিয়ে যেতে দেয়। মহাশূন্যের বিকিরণের বেশির ভাগই বায়ুমণ্ডলে বাধাপ্রাপ্ত হয়। আলোক-তরঙ্গ ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তড়িৎ চুম্বকীয় দোলনের একপ্রকার তরঙ্গ, যা ঐ জানালা দিয়ে নিরুপদ্রবে চলে যায়। আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জানালা বলতে এই জানালাকেই বোঝাচ্ছি।

— বিল, এর পরই আমার বিস্ময়ের পালা। শুধু তোমার আমার কাছে বিস্ময় নয়, সারা পৃথিবীর কাছেও বিস্ময়। আমি বিশ্বাস করি, তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর একটা জানালা খুলে দিয়েছ— বেতার জানালা। হ্যাঁ, আমি ঐ কান-ঝালাপালা-করা শব্দের কথা বা আকাশবাণী, আকাশ-সঙ্গীতের কথা বোঝাতে চাইছি। ওগুলো নিশ্চয়ই বেতার-তরঙ্গ, বিল, ছোট দৈর্ঘ্যের

আমরা ঐ বার্তার অর্থ এখনো উদ্ধার করতে পারি নি। বিল, আকাশের এই সঙ্গীত যেন নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের গোপণ কোন ভাষা। তুমি কি বলতে পার— ঐ সঙ্কেতগুলো বহিরাকাশ থেকে আসছে, আমার এমন সিদ্ধান্তের কারণ খুব সহজ। অদ্ভুত আওয়াজ আমাদের এই রেডিও সেট-এ ঠিক প্রতি তেইশ ঘণ্টা ছাপ্পান্ন মিনিট অন্তর আসছে। আর ওটা আকাশে যে বিন্দুর দিকে আমার এরিয়াল মুখ করে আছ, সেই দিক থেকেই ছোট তরঙ্গগুলো আসছে।

— নক্ষত্রে একটা ট্রান্সমিটার? বিল তো উত্তেজনায় আটখানা। কিন্তু আকাশে তো কোন নক্ষত্র দেখছি না।

— সম্ভবত বেগুনিপারের আলোর মতই কিছু নক্ষত্র আছে, যাদের আমরা দেখতে পাই না। জাংস্কী ধীরে ধীরে বললেন— সম্ভবত কিছু নক্ষত্র আছে, যারা মনুষ্য চোখে দৃশ্যমান নয় অথচ গ্রাহক-যন্ত্রে যাদের উপস্থিতি ধরা পড়ে, শোনা যায়। হয় তারা দৃশ্যমান কোন আলো বিকিরণ করে না, অথবা দৃশ্যমান হলেও ঐ আলো এত ক্ষীণ যে পৃথিবীর চোখে তা ধরা পড়ে না। অথবা ওরা বেতার তরঙ্গ পাঠায়— ছোট আকারের কিন্তু দৃশ্যমান আলোক-তরঙ্গের চেয়ে ওদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনেক বড়।

— নক্ষত্র, যাদের আমরা শুনতে পাই! কিন্তু ওটা তো গুজব, বাবা! তা হলে ওখানে কাউকে বসে থাকতে হবে, ঐ সঙ্কেতগুলো আমাদের কাছে পাঠানোর জন্যে। মা! মা! বিল প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল। মা, এখানে শীগ্‌গির এসো। বাবা অদৃশ্য নক্ষত্র আবিষ্কার করে বসেছেন, যাকে তুমি কানে শুনতে পাবে এবং তিনি বলছেন, সেখানে লোক আছে, যারা মহাশূন্যে বেতার সঙ্কেত পাঠাচ্ছে।······

শ্রীমতি জাংস্কী একটা মাছের দাগা হাতে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন।— সত্যি, তুমি ছেলেটার মাথায় কি যে সব ছাই-পাঁস ঢোকাচ্ছ।

তাঁর স্বামী হাসলেন— মেরী, এ-সব কল্পনা নয়। আমি কিন্তু নক্ষত্রে মানুষ সম্বন্ধে একটা শব্দও উচ্চারণ করি নি। শুধু এইটুকুই বলেছি, নক্ষত্রে বেতার প্রেরকের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু স্রেফ দুর্ঘটনাক্রমে আমি সত্যি সত্যিই একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করে বসেছি। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানের ধারণা ছিল যে মহাশূণ্য থেকে আগত বেতার-তরঙ্গ আমাদের ধরা ছোঁয়ার নাগালের

বাইরে—এর কারণ তড়িতাহত বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তর ঐ বেতার-তরঙ্গ হয় শোষণ করে নেয়, নয় ওগুলো প্রতিফলিত করে! কিন্তু আমরা—বিল এবং আমি—এইমাত্র আবিষ্কার করলাম যে এমন ছোট তরঙ্গ আছে যা তড়িতাহত বায়ুমণ্ডলের স্তর ভেদ করে চলে আসতে সক্ষম, যেন কোন মুক্ত জানালা দিয়ে ওরা চলে আসছে এবং বেতার-গ্রাহকযন্ত্রে ওদের অস্তিত্বও ধরা পড়েছে। মেরী, ব্রহ্মাণ্ড-লোকের বেতার সঙ্কেত! নক্ষত্রলোকের বেতার সঙ্কেত! এখন এদের বোঝা দরকার, বোঝানো দরকার। যেমন যুগ-যুগান্তর ধরে আমরা দৃশ্যমান আলোকের ভাষা পাঠ করার শিক্ষা গ্রহণ করেছি।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মানবজাতি ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও হিংস্রতম যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিশেষভাবে যুদ্ধের কাজেই নিযুক্ত হয়। বেতার তরঙ্গকে যুদ্ধের নতুন নতুন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়—মনোবৈজ্ঞানিক যুদ্ধ প্রসারণ, গোপণ বার্তা প্রেরণ, রেডার যন্ত্রে আকাশে শত্রু-পক্ষকে সনাক্ত করার কাজে এবং জলে ও অন্তরীক্ষে বেতার নিশানা হিসেবে অগ্রসরমান সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনা করার কাজে।

তারপর ১৯৪৫ সাল। যে সব বিজ্ঞানীরা এই ক'বছর রুদ্ধকক্ষে বসে মনুষ্য-সম্প্রদায় নিধনের উন্মত্ততায় ব্যস্ত ছিলেন, তাঁরা মুক্ত হলেন শান্তির ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করার কাজে। যুদ্ধের সীমান্ত পেরিয়ে, পরস্পরের মধ্যে ধ্যান-ধারণা, মতামত বিনিময় এবং বহুদিন ধরে স্থগিত রাখা গবেষণার কাজে।

হল্যাণ্ডবাসী এইচ. সি. ভান ডি হলষ্ট ওঁদের মধ্যে একজন। লেডেনে তাঁর টেবিলে বসে পারমাণবিক যুগের আবির্ভাবের ফলে নতুন এক তত্ত্ব নিয়ে তিনি গবেষণা করছিলেন।

জানা গেছে, পরমাণু নিউক্লিয়াস দিয়ে গঠিত এই নিউক্লিয়াস আবার প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে তৈরি এবং বাইরের দিকে ঋণাত্মক ইলেক্‌ট্রনের বেষ্টনি। ইলেক্‌ট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে। যখন ঐ রকম একটা ইলেক্‌ট্রন নিউক্লিয়াসের নিকটবর্তী কোন কক্ষপথ থেকে লাফিয়ে দূরের অপর একটা কক্ষপথে যায়, তখন নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ শক্তির অধিকারী হয়। কিন্তু প্রায় তৎক্ষণাৎ ওটা আবার লাফিয়ে নিউক্লিয়াসের নিকটবর্তী কোন কক্ষপথে ফিরে আসে এবং ঐ রকম করার সময় ঐ শোষিত

অধিকৃত সমপরিমাণ শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটে, যা আমাদের চোখে আলোর একটা ঝলকানি রূপে দেখা দেয়।

হল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী এ-সবই জানতেন। বরং তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল আরও বিস্তৃত। হাইড্রোজেন পরমাণুকে তিনি সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখছিলেন। হাইড্রোজেন পরমাণুর একটা ধনাত্মক প্রোটন; অতএব ওকে বৈদ্যুতিক তত্ত্বের দিক থেকে নিরপেক্ষ থাকতে হলে ওর ইলেক্‌ট্রনিক বেষ্টনিটি অবশ্যই একটি মাত্র ঋণাত্মক তড়িতাহত ইলেক্‌ট্রন দিয়ে গঠিত হতে হবে। তার ফলেই ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎ পরস্পরের মধ্যে সমতা রক্ষা করবে। পরমাণু বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে পরমাণু ইলেক্‌ট্রন কক্ষান্তরে যেতে যতদূর লাফায়, তার ওপরেই বিকিরণের ধরন নিরূপিত হয়। যদি ইলেক্‌ট্রনের এই লম্ফ বড় আকারের হয়, তা হলে বিকিরণের ধরন হয় বেগুনি পারের আলো; অপরপক্ষে ঐ লম্ফ দৈর্ঘ্য ছোট আকারের হলে বিকিরণের ধরন হয় লাল-উজানি আলো।

ভান ডি. হলষ্ট এবার আরও ভালোভাবে এর পরিমাপে মন দিলেন। তাঁর মতে হাইড্রোজেনের ইলেক্‌ট্রন যদি একই কক্ষপথে নিজেদের মধ্যে সামান্য মাত্রায় নড়াচড়া করে, তা হলে ঐ ইলেক্‌ট্রন আলোক রশ্মি বা তাপ-রশ্মি বিকিরণ করে না। ইলেক্‌ট্রন থেকে যা নির্গত হয়, তা বেতার-তরঙ্গ।

কিন্তু তিনি ঐ মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন না। হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গীত শোনার যত যান্ত্রিক উপকরণ তাঁর নাগালের মধ্যে ছিল না। তৎকালীন কোন বেতার সংগ্রাহক যন্ত্রই ইলেক্‌ট্রনের এই লম্ফের ফলে উদ্ভূত ক্ষীণ বেতার-তরঙ্গকে ধরতে পারে নি। 'সকল জ্যোতির্পদার্থবিদ্‌দের প্রতি বার্তা' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশ করে ভান ডি. হলষ্ট তাঁর বহু সহকর্মীদের শত্রুতার ভাগী হয়েছিলেন। ঐ গ্রন্থে তিনি বেতার-সংগ্রাহক যন্ত্র একুশ সেন্টিমিটার ব্যাণ্ডে বেঁধেছিলেন। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, আমরা হাইড্রোজেন পরমাণুর আওয়াজ শুনতে পাব। হাইড্রোজেন ট্রান্সমিটার একুশ সেন্টিমিটারে কাজ করে।

এ-সমস্তই ভান ডি. হলষ্ট তত্ত্বের দিক থেকে খাড়া করেছিলেন তাঁর পড়ার ঘরে বসে। কিন্তু পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহল তাঁর যুক্তি মানতে অস্বীকার করলেন। পনের বছর আগে ঠিক এমনভাবেই ওঁরা ন্যুইয়র্কের পদার্থ বিজ্ঞানী ও

বেতার ইঞ্জিনিয়ার কার্ল জে. জাংস্কীকে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন, যখন উনি ঘোষণা করেন যে তিনি দূরের নক্ষত্রের শব্দ-তরঙ্গ ধরতে পেরেছেন এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটা বেতার-জানালা খুলে দিয়েছেন। তফাৎটা শুধু এই, ঐ বিজ্ঞানী মহল জাংস্কীর মতকে পাগলের প্রলাপ বলে একেবারে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন আর বিজ্ঞানী ভান ডি. হলষ্টের মতকে উপেক্ষা করেছিলেন।"

ভান ডি. হলষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে বহির্শূন্যে হাইড্রোজেন পরমাণুর পরস্পরের মধ্যে সঙ্ঘর্ষজনিত আওয়াজ একুশ সেন্টিমিটার ব্যাণ্ডে নিশ্চিতরূপেই শোনা যাবে। হাইড্রোজেন পরমাণুর বেতার সঙ্কেতের জন্যেই বিশেষভাবে এই ব্যাণ্ড এবং মহাজাগতিক ট্রান্সমিটার থেকে আগত অন্যান্য মহাশূন্যের বেতার-তরঙ্গকে এ পৃথক করে রেখেছে। হাইড্রোজেন পরমাণু ছাড়া অন্য কারুর বেতারতরঙ্গে এ সাড়া দেয় না।

কিন্তু হল্যাণ্ডবাসীর এ-সব যুক্তিই বৈজ্ঞানিক দিক থেকে ভাসা ভাসা দৃষ্টি হিসেবে অস্বীকার করা হয়েছে। বেতার নক্ষত্রেরা— তিনি তখনও ঘোষণা করে চলেছেন – নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ বিচ্ছুরিত করে— আর এই বিচ্ছুরণ ঘটে ওঁদের রাসায়নিক গঠন প্রকৃতি অনুসারে। আমাদের এই পৃথিবীতে বহির্বিশ্ব থেকে যে বেতার সঙ্কেত আসছে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থেকে আমরা বহির্বিশ্বের ট্রান্সমিটারের রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। যদি এই সঙ্কেত একুশ সেন্টিমিটার ব্যাণ্ডে হয়, তা হলে ট্রান্সমিটার হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত।

বছরের পর বছর গড়িয়ে গেল, কিন্তু ভান ডি· হলষ্টের তত্ত্ব বিজ্ঞানী মহলে কোন কৃতিত্বই পেল না। পরিশেষে, ১৯৫১ সালের ২৫শে মার্চ রাত্রে অদ্ভুত নাটকীয়ভাবে ওঁর যুক্তির প্রমাণ মিলে গেল।

ভান ডি. হলষ্ট তখন কেম্ব্রিজের হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি হিসেবে বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। একদিন খুব কাজকর্ম ও ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। রাত্রে ক্লান্ত অবসন্ন দেহটা সবে সঁপে দিয়েছেন। এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল। বিশ্ববিদ্যালয়ের জোতির্বিভাগের দু'জন বিজ্ঞানী বাইরে দাঁড়িয়ে।

— স্যর, আপনি এখনই একবার আসুন। আপনার সিদ্ধান্ত অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। আমরা এখনই আপনার হাইড্রোজেন সঙ্গীত শুনেছি।

ভান ডি. হলষ্ট তাড়াতাড়ি পোষাক পরিচ্ছদ বদলে নিলেন, পায়ে চটি

জোড়া গলালেন এবং ঐ বিজ্ঞানী ভদ্রলোক দু'জনকে অনুসরণ করতে করতে মানমন্দিরে গিয়ে উঠলেন। সেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিকতম বেতার দূরবীণের এরিয়ালটি মহাকাশের ছায়াপথের একটি নির্দিষ্ট দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল। গ্রাহক-যন্ত্রের উপকরণ ছিল একুশ সেন্টিমিটার ব্যাণ্ডে বাঁধা।

অবশেষে, অবিশ্বাসী শ্রোতৃমণ্ডলের কাছে বছরের পর বছর বক্তৃতা দেবার পর ভান ডি. হলষ্ট বিজয়ী হলেন। ওখানে ঐ মুহূর্তে, মহাশূন্যের গভীর গহন প্রদেশ থেকে উৎসারিত হচ্ছে হাজার হাজার আলোকবর্ষ পারের হাইড্রোজেন পরমাণুর মহাসঙ্গীত; কখনো সঙ্গীতের ধারা একে অন্যের সঙ্গে এসে মিশছে, কখনো বা পরস্পরের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে, কখনো বা সেকেণ্ডের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশে উজ্জ্বল বেতার তরঙ্গ বিচ্ছুরিত করছে।

হল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লেন— ভদ্রমহোদয়গণ। তিনি অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, এ-সবই এক যুগান্তকারী ঘটনার প্রথম সূত্রপাত। আজ এক নতুন বিজ্ঞানের সূচনা হলো— বেতার জ্যোতির্বিদ্যা। একটা নতুন বিশ্ব, এতকাল ধরে ছিল আমাদের চোখের আড়ালে লুকিয়ে, তা আজ উন্মুক্ত হলো আমাদের কানের পর্দায়। এ এক গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্ত। বহু বছর আগে বর্ণালী বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা বর্ণদর্শীর মধ্য দিয়ে সূর্যের হীলিয়াম মৌলের সন্ধান পেয়েছি। আর আজ আমরা আর এক ধাপ এগিয়ে গেলাম। আমাদের বেতার দূরবীণের সাহায্যে আগামী দিনে আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নক্ষত্রের রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে শুনতে পাব। কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, রাত্রি অনেক গড়িয়ে গেছে। আজকের মত আমরা আমাদের সৌর-লোকের ও নক্ষত্র-লোকের যাত্রা স্থগিত রেখে কয়েক ঘণ্টা ঘুমোবার চেষ্টা করব। নতুন দিনের সুপ্রভাত আগামীকাল···।

মহাকাশ রশ্মি

ডাকশুণ্ড ওয়াল্ডি চিৎকার করছে। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ ভিক্টর ফ্রাঞ্জ হেস বাতাসের চেয়ে হাল্কা বেলুনের সঙ্গে স্থাপিত বিদ্যুত-মাপক যন্ত্রটি নিচে রেখে দিয়ে কুকুরটার দিকে তাকালেন।

— তুই ভাবছিস বোধ হয়, তোকে কেন আবার ওপরে নিয়ে যাচ্ছি। ঠিক আছে। চুপ করে বোস। কোন হৈ চৈ করিস না।

হেসের বাবা পশুপালক ছিলেন এবং ছোট বেলা থেকেই হেস কখনও কুকুর ছাড়া থাকেন নি। কুকুরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিজের ভাবনা চিন্তাগুলো বেশ সাজিয়ে নেওয়া যায়— হেস ভাবতেন।

—ওয়াল্ডি, তুই যদি আমার কথামত কাজ করিস, আমি তোকে সব জানাব। আমরা দু'জনে মিলে মিশে কি করতে যাচ্ছি। তুই তো জানিস, তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে বিকিরণ কতদূর যাবে, তার পরিমাপ নিয়ে আমরা এতদিন ব্যস্ত ছিলাম। আর আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি, উৎস থেকে কয়েক শ' গজ দূরে ঐ রশ্মি আর ধরা যায় না। ও, তুই এ-সব শুনছিসই না, ওয়াল্ডি। এতে তোরই ক্ষতি— কারণ আমি তোকে সবে আয়নীকরণ ব্যাপারটা বোঝাতে যাচ্ছিলাম।

ওয়াল্ডি কি বুঝল কে জানে, কেবল ল্যাজ নাড়াতে লাগল।— ও তা হলে তুই বুঝতে চাস? তবে শোন। তোর পাশের ঐ উপকরণটা কি, জানিস— বিদ্যুৎ-মাপক যন্ত্র। যন্ত্রটিতে বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটালে ওর ডায়ালের কাঁটা লাফাতে শুরু করে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কাঁটাটা আবার ধীরে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে, যেন ঐ বিদ্যুৎ প্রবাহ কে চুরি করে নিচ্ছে এবং বাতাসের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বেকলের ও মেরী কুরীর পরীক্ষার পরই আমরা প্রকৃতপক্ষে জানতে পারি, ওখানে কি ঘটছে। এখন আমরা জানি, তেজস্ক্রিয় রশ্মি বাতাসকে বিদ্যুৎবাহী করে তোলে। সাধারণ ভাবে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় পরমাণুগুলো বৈদ্যুতিক দিক থেকে নিরপেক্ষ থাকে এবং সেইজন্য বিদ্যুৎ বহন

করে না। কি রে ওয়াল্ডি, তোর মাথায় ঢুকছে না? কিন্তু যা বললাম, সবই তো গোড়ার কথা। প্রত্যেক গ্যাসীয় পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যতগুলো ধনাত্মক প্রোটন থাকে, ওর বেষ্টনীতে ঠিক ততগুলো ঋণাত্মক ইলেক্‌ট্রন থাকে। সামগ্রিকভাবে গ্যাসীয় পরমাণু তাই বৈদ্যুতিক দিক থেকে নিরপেক্ষ। কিন্তু যখন তেজস্ক্রিয় রশ্মি ঐ গ্যাসীয় পরমাণুকে গিয়ে আঘাত করে, তখন কতকগুলো ইলেক্‌ট্রন বেষ্টনীর বাইরে ছিটকে আসে। ওটাই গ্যাসীয় পরমাণুর অবস্থায় পরিবর্তন ঘটায়। এখন অবস্থা দাঁড়াল এই: আয়ন দেখা দিল—অর্থাৎ ঐ গ্যাসের কতকগুলো পরমাণুর বেষ্টনীতে এখন ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা গেল কমে। অন্য পরমাণুগুলোয় ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা দাঁড়াল বেশী। এর অর্থ কতকগুলো বৈদ্যুতিক দিক থেকে ধনাত্মক আর অপরগুলো ঋণাত্মক। উভয়প্রকার পরমাণুর মধ্যেই কিন্তু নিরপেক্ষ হবার প্রবণতা। কতকগুলো চাইছে একটা নতুন ইলেক্‌ট্রন কুড়িয়ে ওদের হারানো ইলেক্‌ট্রনের ক্ষতিপূরণ করতে, অপরপক্ষে অন্য পরমাণুগুলো চাইছে তাদের অতিরিক্ত ইলেক্‌ট্রনটা ছিট্‌কে দিতে। এই কারণে আয়নীকৃত গ্যাসীয় পরমাণুর মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চারিত হয়। বাতাস বিদ্যুৎবাহী হয়ে দাঁড়ায় এবং আমাদের বিদ্যুৎ-মাপকযন্ত্র বিদ্যুৎ-আবেশ হারায়। কিন্তু এখন ওয়াল্ডি, আমাদের সামনে কঠিন প্রশ্ন: বিকিরণের উৎস আশেপাশে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বাতাসও আয়নীকৃত নয়, তবুও আমাদের বিদ্যুৎ-মাপকযন্ত্র কেন তার তড়িৎ-আবেশ হারাবে?

— তুমি এর কোন উত্তর দিতে পারবে না, ওয়াল্ডি। আমিও পারব না। এখন পর্যন্ত অন্য কোন বিজ্ঞানীও পারবেন না। কিন্তু প্রশ্নটার একটা অন্য দিক আবার দেখা দিচ্ছে। ওখানে মেঝের ওপর, আমাদের বিদ্যুৎ-মাপক যন্ত্রটা রয়েছে। আশেপাশের বাতাসেও ওর বৈদ্যুতিক আবেশ ক্রমশ হারাচ্ছে। কিন্তু আশে পাশে তো কোন বিকিরণ-উৎস নেই, অতএব এখানকার বাতাস বিদ্যুৎ-বাহী হতে পারে না! বেশি কথা কি, এই অবশিষ্ট আয়নীকরণ তো পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়। মাটির নীচেকার তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকীর্ণ রশ্মি থেকে যে এই আয়নীকরণ ঘটছে— বিজ্ঞানীরা এ-বিষয়ে মোটামুটি একমত হয়েছেন। কিন্তু ওয়াল্ডি, আমি এ-তত্ত্বে তেমন সন্তুষ্ট হতে পারছি না। কেবল এ পর্যন্ত আমি তা নস্যাৎ করতেও পারি নি। তুমি আর আমি আমাদের পরীক্ষাগারের পরীক্ষা থেকে কিন্তু নিশ্চিত হয়েছি যে তেজস্ক্রিয়

পদার্থের প্রকৃত বিকিরণ মাত্র কয়েক গজ ব্যাসার্ধ জুড়ে বিস্তার লাভ করে। আর সেই জন্যেই আমরা বাতাসে উঠতে চাইছি।

ডাকশুণ্ড এবার একটু অস্থিরভাবে উসখুস করে উঠল।— একটু অপেক্ষা কর তো, ওয়াল্ডি। তুমি জানতে চাও তো, কেন আবার তোমাকে ওপরে নিয়ে যাচ্ছে? জানি, বাতাস লেগে তুমি আবার রোগে পড়বে, ভয়ে কাঁপতে থাকবে। একটু পরেই তুমি ওপরে নিয়ে যাবার কারণটা বুঝতে পারবে। নানা রকম তেজস্ক্রিয় পদার্থের রশ্মিই যাদ বাতাসের আয়নীকরণের কারণ হয়, তা হলে মাটি থেকে পনের শ' ফুট ওপরে তেজস্ক্রিয় রশ্মির নাগালের বাইরে বাতাস নিশ্চয়ই বিদ্যুৎ-বাহী হতে পারে না! তা হলে চলো ওয়াল্ডি; তুমিও এ-ব্যাপারে লেগে যাও। দেখো, যদি অবশিষ্ট আয়নীকরণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে পার! এসো, আমরা পনের শ' ফুট ওপরে ওঠার চেষ্টা করি।

ডাকশুণ্ড ওয়াল্ডি যেন ওঁর কথা কত বুঝেছে, এমনি ভাবে এক লাফ মারল। হেস তার ল্যাজ ধরে নিয়ে গিয়ে বেলুনে তুললেন।

এবার যাত্রারম্ভের সব প্রস্তুত। অধ্যাপক হেসের হেফাজতে প্রেরিত এয়ারো ক্লাবের কয়েকজন লোক তাদের যাত্রার ব্যাপারে সাহায্য করলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ওয়াল্ডি চিৎকারে বুঝিয়ে দিল যে বেলুনে বাতাস লেগেছে। তাঁরা দ্রুত ওপরে উঠছেন।

— এ-যাত্রায় কিছু সাহসের দরকার। হেস ডাকশুণ্ডকে স্মরণ করিয়ে দিলেন।— বিদ্যুৎ-মাপক যন্ত্রটার ওপর চোখ রাখো। তুমি এখন ন'শত ফুট ওপরে উঠেছ, কিন্তু আয়নীকৃত বাতাস এ পর্যন্ত একফোঁটাও নেই। অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? বেশ, আমরা শীগ্‌গির এ-ব্যাপারে অনুসন্ধান করব। এক হাজার ফুট……বারো শ' ফুট……পনের শ' ফুট। এখন তোমার কি মনে হচ্ছে। পনের শ' ফুট। ওপরে মাটির তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নিশ্চয়ই ধরা পড়বে না। অথচ দেখা যাচ্ছে, আয়নীকরণ অন্তত দুই জুল পরিমাণ কমে গেছে। চিৎকার করে করে তুমি কি জানাতে চাইছ? ভাবছ বোধ হয় আমাদের আরও ওপরে উঠতে হবে? তোমার বোধহয় মনে হচ্ছে, এই নগণ্য দুই জুল কমে যাওয়া পৃথিবী থেকে বিকিরণ কম হওয়ার ফলশ্রুতি। আমার তো বিশেষ করে তাই মনে হচ্ছে।

তাঁরা আরও ওপরে উঠলেন। প্রথমে তিন হাজার ফুট। তারপর চার হাজার পাঁচশ' ফুট।

ওয়াল্ডি এখন বেলুন-যানের এক কোণে শুয়ে রয়েছে। তার ল্যাজটা পেছনের দুটো পায়ের মধ্যে, সামনের দুটো পায়ের মধ্যে তার মাথা, একটু কাঁপছে সে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ এ-সব আলোচনার মধ্যে তার কোন উৎসাহ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

কিন্তু হিসেব-নিকেশ, পরিমাপ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ উৎসাহী। সমানে আপনমনে বকেই চলেছেন।— আমরা চার হাজার পাঁচ শ' ফুট ওপরে। অতএব এখন আর আমাদের চার পাশের বাতাসে আয়ণীকরণের কোন চিহ্নই নেই। মাটি থেকে কোন তেজস্ক্রিয় রশ্মি নিশ্চয়ই এক মাইল ওপরে উঠতে পারে না। কিন্তু ঐ যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে তাকাও— গভীর আনন্দে হেস চিৎকার করে উঠলেন। ওরা যদি উল্টোপাল্টা কিছু না বলে, বলার অবশ্য কোন কারণ নেই, তা হলে আমাদের বিদ্যুৎ-মাপক যন্ত্র পৃথিবী পৃষ্ঠে যেমন নির্দেশ করে, এখানেও ঠিক তেমনি সমতূল্য আয়নীকরণ সূচিত করেছে। যে দুই জুল আমরা কোথাও হারিয়ে বসেছিলাম, আমরা আবার তা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। এর অর্থ দাঁড়ায়, বাতাসের বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা যদি ধীরে ধীরে কমে আসছিল, কিছুদূর ওপরে ওঠার পর তা আবার রহস্যজনকভাবে বেড়ে গেছে। সত্যিই এটা এক অদ্ভুত ব্যাপার!

ডঃ হেসের অবস্থা হতচকিত হবার চেয়েও কিছু বেশী।— বেশ অদ্ভুত কিছু একটা এখানে ঘটেছে— তিনি চিৎকার করে তাঁর চিন্তাটা ঘোষণা করলেন। যদিও বাতাসের গ্যাসীয় পরমাণুর ওপর মাটির কোন রশ্মির প্রভাব পড়ছে না, প্রতি কয়েক ফুট ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিকিরণের প্রভাব বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে! আমরা এখন প্রায় দশ হাজার ফুট ওপরে এবং আয়নী-করণের পরিমাণ— প্রায় চার জুল গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-সবের অর্থ কি? ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা-ভাবনা করা যাক।

ওয়াল্ডি পৃথিবীর কাছে এখন মৃত, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ডঃ হেসের। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন— এখন আমাদের সমস্যা এই অদ্ভুত রশ্মিগুলোর একটা মনোমত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া; বাতাসে ওদের আয়নীকরণ-প্রভাব যখন সনাক্ত করা গেছে, তখন ওরা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কোত্থেকে ওরা

আসছে? স্পষ্টতই ওরা ধরা-পৃষ্ঠের রশ্মি নয়। তা হলে ঐ রশ্মি নিশ্চয়ই পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে আসছে, মহাকাশ থেকে, ব্রহ্মাণ্ড থেকে। সাধারণ গণনা থেকেই প্রমাণ করা যেতে পারে যে, বায়ুমণ্ডলের এই বিকিরণের স্রোতের পরিমাণ আমাদের পরীক্ষিত আয়নীকরণের মাত্র কুড়ি ভাগের এক ভাগ। অতএব এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে এটা এযাবং অপরিচিত উচ্চ অন্তর্ভেদী শক্তি-সম্পন্ন এক ধরনের বিকিরণ, যা মহাকাশ থেকে আসছে। পৃথিবীর বহির্ভাগ থেকে আবির্ভূত হচ্ছে বলে আমরা এদের মহাজাগতিক বিকিরণ বলতে পারি। কী অলৌকিক ব্যাপার! আর যতই উপরে ওঠা যায়, ততই এর বিকিরণের তীব্রতা বেড়ে যায়। সূর্য থেকে ওটা আসছে না তো? পরীক্ষা করলে সহজেই ধরা যাবে। কেবল সূর্য গ্রহণের সময় আমাদের একবার পৃথিবীর উর্ধ্বে যাত্রা করতে হবে। তখন যদি দেখা যায়, ঐ রশ্মি ঠিক এখানকার মতন উচ্চ শক্তিসম্পন্ন, তার শক্তিমত্তা দিনে-রাত্রে একই রকম, তা হলে বুঝতে হবে, ওর উৎস সূর্যে নয়, অন্য কোথাও। কিন্তু কোথায় কতদূরে, কোন্ লোকে? কি দিয়েই বা তৈরি? এখন আমরা পনের হাজর ফুট ওপরে উঠে এসেছি, বিকিরণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। মাটির বিকিরণের চেয়ে প্রায় ষোল গুণ বেশি…।

১৯৩৮ সালে, ঐ স্মরণীয় বেলুন-যাত্রার এক শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ সময়েরও পরে, ডঃ ভিক্টর হেস বহিরাকাশ থেকে আগত এক বিশেষ বিকিরণ রশ্মি যে আবিষ্কার করে বসেছেন— এ সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞানীর মনেই কোনরূপ সন্দেহ জাগে নি। বিজ্ঞানীরা শুধু বুঝে উঠতে পারেন নি, মহাকাশের ঠিক কোথায় এর উৎস এবং কি থেকে এর উৎপত্তি! মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য বিশ্ব জুড়ে মানমন্দির স্থাপিত হতে লাগল, হাজারে হাজারে বিজ্ঞানী ঐ মহাজাগতিক রশ্মির ওপর কাজ শুরু দিলেন।

পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল যে তথাকথিত প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মি প্রধানত হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস বিশেষতঃ প্রোটন দ্বারা গঠিত। আলোকের চেয়ে কিছু কম গতিবেগ নিয়ে এবং লক্ষ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্টের শক্তি নিয়ে সুদূর মহাকাশের গহন প্রদেশ থেকে ওরা পৃথিবীপৃষ্ঠে ছুটে আসছে। প্রায় কুড়ি মাইল উর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলের পুরু স্তরে বিপুল শক্তি নিয়ে আঘাত করার সময় তারা বাতাসের পরমাণুর নিউক্লিয়াসদের

ভেঙে চুরমার করে দেয়। এই প্রচণ্ড সঙ্ঘাতে প্রাথমিক প্রোটনগুলো তাদের সুবিপুল শক্তি বায়ুমণ্ডলের গ্যাসের বিচূর্ণ নিউক্লিয়াসের মধ্যে করে দেয়। প্রোটন, নিউট্রন, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক ইলেকট্রন এবং অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী মেসন নামের বস্তুকণা— বস্তুপুঞ্জে যা সচরাচর চোখে পড়ে না, এর পরে তাদের বৃষ্টি হতে থাকে পৃথিবীপৃষ্ঠে পরোক্ষ বিকিরণ রূপে। ছয় মাইলের কাছাকাছি উচ্চতায় এই মেসন বস্তুকণার অধিকাংশই সেকেণ্ডের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগের মধ্যে আবার ইলেকট্রনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। শক্তির এই ভীষণ ভয়াবহ রূপান্তর গভীর অন্তর্ভেদী এক্স-রে'র জন্ম দেয়, যা অত্যন্ত কঠিন 'গামা বিকিরণ' নামে পরিচিত। এই গামা রশ্মি এমন কি কখনো কখনো মেসন প্রায়ই পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছায় এবং কখনো কখনো মাটির তিন হাজার ফুট কি তারও বেশি নিচে তাদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে।

বিজ্ঞানীরা গণনা করে দেখেছেন যে এই ক্ষুদে মহাজাগতিক বাণে প্রতিটি মানুষই সেকেণ্ডে প্রায় কুড়ি বার বিদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু স্বাস্থ্য বা জীবনের ওপর তদের কি প্রভাব— তা আমরা এখনো সঠিক জানি না। আমরা শুধু এইটুকু জানি যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কাছে আমরা অত্যন্ত ঋণী, কারণ বর্মের মত ওটা আমাদের রক্ষা করছে এবং পতনশীল উপ-পরমাণুর বাণগুলোর অধিকাংশ শোষণ করে নিচ্ছে।

শেষ পর্যায়ের টেপ রেকর্ডিং পর্যন্ত গঠিত হয়েছে এবং বিভিন্ন উচ্চতায় বিকিরণের তীব্রতায় পরিমাপের সর্বশেষ মান তালিকায় স্থান পেয়েছে, চিত্রে অঙ্কিত হয়ে দেওয়াল ভরে তুলছে। দক্ষিণ আমেরিকার কোন এক মান-মন্দির থেকে ঐ চুম্বকীয় টেপ এসেছে। মানুষের কানে উচ্চ আওয়াজের এই বিদ্‌ঘুটে মিশ্রণের রেকর্ডিং কয়েক মাস আগে দক্ষিণ গোলার্ধে কয়েক হাজার বার প্রদক্ষিণ করার সময় আমেরিকার সর্বশেষ ও বিশেষ সফল কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরার-৪ বেতার সঙ্কেতের মাধ্যমে গৃহীত হয়।

—আজ এই পর্যন্ত জো, জেম্‌স এ. ভান অ্যালেন তাঁর তরুণ কম্প্যুটর বিশেষজ্ঞকে বললেন। সুইচ বন্ধ করে দাও, এসো বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ নিরুত্তেজক কিছু উপভোগ করা যাক।

জো একটা স্পর্শ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনিক কম্প্যুটিং মেশিনের গায়ে যেখানে অঙ্কগুলো বিশ্লেষিত হয়ে উঠেছিল তার রঙীন

আলোগুলো নিভে গেল। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্যানেল থেকে সে উঠে দাঁড়াল। ঘামে তার মুখ ভিজে গেছে, গায়ে জামাটা সেঁটে বসেছে। বেশ বেশ, বলল ও।— আমার গোটা দুয়েক বাটি হলেই চলবে।

ভান অ্যালেন তাঁর ব্যক্তিগত পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ঘরটায় প্রয়োগশালা ও থাকার ব্যবস্থা দুই-ই আছে। এক কোণের একটা রেফ্রিজারেটর থেকে তিনি চার পাত্র 'বিয়ার' বার করলেন এবং বই রাখার একটা সেল্‌ফের নিচের তাক থেকে দুটো গেলাস নিলেন। তারপর একটা চেয়ারে শরীরটা সঁপে দিলেন এবং জো-কেও অনুরূপ নির্দেশ দিলেন।

১৯৫৯ সালের জুন মাস। মধ্য-পশ্চিমীয় গ্রীষ্মকাল পুরোমাত্রায় শুরু হয়ে গেছে। সর্বাধুনিক শীত-তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সরকারী আয়োয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভান অ্যালেনের পদার্থ বিভাগে গরম যেন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

—এরকম দিনে আমি উত্তর অতলান্তিকের দিকে যেতে চাই। গ্রীনল্যাণ্ডের কাছাকাছি সামুদ্রিক তটরক্ষক কোন জাহাজে অথবা বেফিন উপসাগরে। গরমের দিনে কি উপভোগ্য লাগতো ঐ জায়গাগুলো।

— তখন তো সব শুরু হয়ে গেছে, তাই না? জো জিগ্যেস করল। যখন ঐ বিকিরণ বন্ধনী নিয়ে আপনি প্রথম অনুমান করলেন এবং পরে যার নামকরণ হয় আপনার নামানুসারে?

ভান অ্যালেন গ্লাসটা চুমুক দিয়ে শেষ করে আর একটা পাত্র থেকে আবার ভর্তি করে নিলেন।— না, আমরা তখনো কোন বিকিরণ বন্ধনীর কথা ভাবি নি। আমাদের পর্যবেক্ষণের ফলাফল দেখে আমরা নিজেরাই হতচকিত, বিস্মিত! তুমি কি ও-সম্বন্ধে শুনতে চাও, জো?

— নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

গ্রীনল্যাণ্ড ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের কাছে সামুদ্রিক তটরক্ষক ও নৌসেনাবাহিনীর জাহাজে ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালের গরমের দিনে আমরা কাটাতে থাকি। পৃথিবীর চুম্বকীয় মেরুপ্রদেশে, যেখানে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের দরুণ রশ্মির বিক্ষেপণ ঘটবে। আমরা মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতা পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করছিলাম। কৃত্রিম উপগ্রহ, স্পুটনিক অবশ্য তখনও আমাদের চিন্তায় স্থান পায় নি। আমরা তখন 'রোকুন' ব্যবহার করেছি।

— রোকুন ? জো সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল— সে আবার কি ?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ রোকুন। বেলুন দ্বারা পরিচালিত রকেট। প্রথমে বেলুন বার থেকে পনের মাইল উঠে যাবে, তারপরে রকেটে অগ্নিসংযোগ ঘটবে এবং আমাদের যন্ত্রপাতি ষাট থেকে সত্তর মাইল ওপরে উঠে যাবে। আজকের দিনে মনে হচ্ছে, কি আর এমন ওপরে, তাই না ? কিন্তু ১৯৫২ সালের তুলনায় এটাই যথেষ্ট ছিল। বেশ ভালভাবেই শুরু হলো। আমি বোঝাতে চাই, আমরা আমাদের আশানুরূপ ফল লাভ করলাম। যতই ওপরে উঠলাম, দেখা গেল, মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু ১৯৫৩ সালে ছুটো রোকুন অভাবনীয় সংবাদ আনল। ত্রিশ মাইল ওপরে আমাদের আশার অতীত বিকিরণের তারা সম্মুখীন হলো এবং কিছুদিনের মধ্যেই ধ্রুবীয় প্রকাশের প্রভাবহীন ক্ষেত্রেও অনুরূপ ফল দেখা গেল। তুমি তো জান, ১৯৫৫ সালের গ্রীষ্মকালে কর্তৃপক্ষ একমত হলেন যে কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বর্ষ-সূচীতে আমেরিকার অবদানের মধ্যে কৃত্রিম উপগ্রহের প্রকল্প সরকারী কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হলো। প্রথমে ভ্যানগার্ড যানের জন্যে আমরা উপযুক্ত উপকরণের নক্শা তৈরি করলাম কিন্তু রকেটগুলো আশানুরূপ ফল দিতে পারল না। কক্ষপথে রাশিয়াই সর্বপ্রথমে স্পুটনিক-১ স্থাপন করল।

একটু হেসে জো জিগ্যেস করল— স্পুটনিক নিশ্চয়ই একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আমি আমার প্রশিক্ষণ শেষ করে যখন স্নাতকোত্তর শিক্ষায় মন দিয়েছি, রাশিয়া তখন তার প্রথম মহাকাশযান প্রেরণ করে। কিন্তু আমার স্মরণ হচ্ছিল, জুপিটর রকেটের ব্যবহার সম্বন্ধে আপনারা কিছুদিন যাবৎ নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

— ঠিকই ধরেছ ভান অ্যালেন বললেন। যখন দেখলাম ভ্যানগার্ড ঠিকমত কাজ করছে না তখন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আমেরিকান কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে জুপিটর সি রকেট ব্যবহারের কথা বলেছিলেন। কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহ ও রকেটের যন্ত্রপাতির ভারই আমার ওপর ন্যস্ত ছিল, রকেটের ইঞ্জিনের দেখাশোনা আমার কাজ ছিল না। যা হোক, সরকার আমাদের কথা মেনে নিলেন এবং ১৯৫৮ সালের ৩১শে জানুয়ারি এক্সপ্লোরার-১ কক্ষপথে গেল। এক্সপ্লোরার-১ এর সঙ্গে ছিল একটা মহাজাগতিক

রশ্মি তদন্তকারী উপকরণ এবং ওর পঠিত তথ্যগুলো প্রেরণের জন্যে একটা রেডিও। আমাদের প্রথম বিবরণ আপানুরূপ হলো : বিকিরণের তীব্রতা ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর লোকে যাবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে দক্ষিণ আমেরিকার ও দক্ষিণ আফ্রিকার ষ্টেশন থেকে যখন বার্তা আসতে লাগল তখন আমাদের আবার বিস্ময়ের পালা। ঐ দুই ষ্টেশনে কৃত্রিম উপগ্রহ আপন আপন কক্ষের উৎকেন্দ্রিকতার জন্যে আরও উপরে উঠতে লাগল। বিষুব অঞ্চলের ওপরে উচ্চ অক্ষাংশে গণনার মাত্রা কমতে কমতে কখনো কয়েক মিনিটের জন্যে শূন্যে এসে দাঁড়াল। এর অর্থ বোধগম্য হলো না। যান্ত্রিক উপকরণগুলোর ওপরই কেমন সন্দেহ জাগল। আর একটা অসুবিধে হলো, আমাদের পাঠগুলো আসতে লাগল অসম্পূর্ণ-ভাবে, কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর। অবশ্য বার্তা নিরবিচ্ছিন্নভাবেই প্রেরিত হচ্ছিল, কিন্তু মর্ত্যের ষ্টেশনের চৌহদ্দির মধ্যে এলেই কেবল তা ধরা গেল।

ভ্যানগার্ড প্রকল্পের জন্যে আমরা যে উপকরণের উদ্ভাবন করেছিলাম, তা এর চেয়ে অনেক বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। এটা পরিলক্ষিত তথ্যগুলো সঞ্চয় করে রাখতে পারত এবং মর্ত্যের বেতার নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়ে বার্তা প্রেরণ করতে পারত। আমরা দিবারাত্র কাজ করে এই যান্ত্রিক উপকরণকে পরবর্তী কৃত্রিম উপগ্রহে কাজে লাগাতে চাইলাম, কিন্তু এক্সপ্লোরার-২ অকৃতকার্য হলো এবং ওর কক্ষপথে পরিক্রমা করতে পারল না। অবশ্য প্রায় সমগোত্রীয় যন্ত্রপাতি দ্বারা এক্সপ্লোরার-৩ সুসজ্জিত হলো। এক্সপ্লোরার-৩ ১৯৫৮ সালের ২৬শে মার্চ কক্ষপথে পরিক্রমা করতে গেল। এবার আমরা ভাবলাম, বিকিরণের তীব্রতার দরুণ হঠাৎ নেমে আসার ধাঁধাটার সমাধান করা যাবে। প্রথম থেকেই আমাদের এলোমেলো আজগুবি ফলা-ফলগুলোর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেল। দুই থেকে তিনশ’ মাইল উচ্চে গণনার মাত্রা অনেক নিচে দেখা গেল ; তারপর ওটা তর তর করে বেড়ে গেল পাঁচ থেকে ছয় শ’ মাইল উচ্চতা পর্যন্ত ; তারপর আবার নেমে এল একেবারে শূন্যে। মেকইলওয়িন ধাঁধাটার সমাধান করে দিলেন ; কিন্তু ওনার ব্যাখ্যাটা এত সহজ, সরল ও স্বাভাবিক ছিল যে আমরা নিজেরাও ভেবে পেলাম না আমাদের মাথায় জবাবটা আসেনি কেন। মেকইলওয়িন বুঝিয়ে দিলেন, কারণটা অতি সহজ, খুব দ্রুত গণনায় গণক নিজেই অকেজো হয়ে পড়ে

এবং শূণ্য অঙ্ক নির্দেশ করে। পরের দু'মাসের অসংখ্য পশ্চাৎগণনার ফলে আমরা বুঝতে পারলাম, এটাই নির্ভুল ব্যাখ্যা। যেটা গণক ঠিকমত বোঝাতে পারল না, সেটা হলো বিশেষ একটা উচ্চতায় বিকিরণের তীব্রতা এতদূর বেড়ে যাবে কেন।

—বেশ, পরের দু'মাস তো আমরা অনেক গণনা পেলাম, কিন্তু সমস্তই একই তথ্য তুলে ধরল। নিচের উচ্চতাগুলোয় বিকিরণ-তীব্রতা ধীরে ধীরে বেড়ে যায়। মহাজাগতিক রশ্মিই এর কারণ বলে মনে হলো। আরও উচ্চে বিকিরণ-তীব্রতার মান অসম্ভব রকম বেড়ে যায় এবং গণক অকেজো হয়ে পড়ার আগে ঐ অঙ্ক দাঁড়ায় তাত্ত্বিক দিক থেকে মহাজাগতিক রশ্মির বেলায় যা আশা করা যায় তার প্রায় হাজার গুণ। ১৯৫৮ সালের ১লা মে জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমী এবং আমেরিকান ভৌতিক সোসাইটিতে বিবরণ দেবার মত বিষয়টা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। বিবরণে লেখা হলো, পাঁচশ' মাইল উচ্চে উচ্চ-বিকিরণ তীব্রতার অঞ্চল। তড়িতাহত বস্তুকণার প্রভাবেই এমনটি ঘটছে— এমন একটা মতবাদ আমাদের গড়ে উঠল। এই তড়িতাহত বস্তুকণার মধ্যে রয়েছে বিশেষ করে প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রন, যারা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে বাঁধা পড়ে গেছে।

ওটা তো নিঃসন্দেহে একটা বিশেষ উত্তেজক আবিষ্কার এবং আপনার যান্ত্রিক উপকরণের একটা বিশেষ জয়— জো বলল। বিশেষ করে আমাদের কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর আকার যখন ফুটবলের চেয়ে বড় ছিলনা।

— হ্যাঁ, আমরা নিজেরাও খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম এই আবিষ্কারে, ভান অ্যালেন বলতে লাগলেন। আরও নির্ভুল উপকরণ তৈরির কাজে আমরা মনোনিবেশ করলাম। আমরা আরও ছোট একটা গাইজার টিউব নিলাম। যাতে আরও নিম্নমাত্রার বিকিরণ গণনা সম্ভব হয়; শ্রেণীবদ্ধভাবে পরিমাপ-জ্ঞাপক সার্কিটের সঙ্গে আমরা ওটাকে যুক্ত করে দিলাম। ১৯৫৮ সালের ২৬শে জুলাই এক্সপ্লোরার-৪ ঐ উপকরণ নিয়ে কক্ষপথে গেল। পরবর্তী ঘটনা আমাদের ভালভাবেই জানা আছে। দু'মাস ধরে ওটা বিভিন্ন তথ্য প্রেরণ করতে লাগল— সর্বসমেত আমরা তিন হাজার ছ'শত তথ্য সংগ্রহ করি। তুমি জান, ওগুলো নিয়ে আমরা আজও বিচার বিশ্লেষণ করছি। কিন্তু শুরু থেকেই আমরা জানতাম, মেকইলওয়িনের বিশ্লেষণ নির্ভুল। পাঠগুলো থেকে

বিকিরণের সর্বোচ্চ স্তরের পরিমাপ নির্ভুল প্রমাণিত হলো। কিন্তু আমাদের কাছে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এক্সপ্লোরার ১, ৩ ও ৪ বিকিরণ বন্ধনীর কেবল নিম্নস্তর পর্যন্ত প্রবেশ করেছে এবং নিখুঁত ও সম্পূর্ণ চিত্র পেতে হলে আমাদের যান্ত্রিক উপকরণগুলোকে আরও উর্ধ্বে প্রেরণ করতে হবে।

— আমাদের প্রথম চন্দ্র-চর্চা শুরু হয় যখন পাইওনিয়র-১ ১৯৫৮ সালের ১১ই অক্টোবর পাঠানো হয়। তিন দিন ধরে প্রায় সত্তর হাজার মাইল জুড়ে ওটা বিকিরণের তীব্রতার পাঠ সংগ্রহ করে। পাঠগুলো খাপছাড়া ভাবে নেওয়া হলেও, ওগুলো থেকে সহজেই উদ্ধার করা যায় যে বিকিরণ অঞ্চল হাজার হাজার মাইল ব্যাপী বিস্তৃত হয়ে আছে এবং পৃথিবী থেকে দশ হাজার মাইল পর্যন্ত ওর তীব্রতা সবচেয়ে বেশি। দুর্ভাগ্যক্রমে পাইওনিয়র-২ বিফল হয়। কিন্তু ১৯৫৮ সালের ৬ই ডিসেম্বর পাইওনিয়র-৩ সুন্দরভাবে যাত্রা করে। অবশ্য তুমিও তখন আমাদের সঙ্গে ছিলে, জো। কিন্তু রকেটটা পরিচালনার ব্যাপারে কিছু গোলযোগ দেখা দিল এবং চাঁদে না গিয়েই ওটা পেছনে চলে আসে। কিন্তু তবু আমরা উল্লসিত হয়ে উঠলাম— কারণ এর গমন ও প্রত্যাগমনে অপূর্ব ফল পাওয়া গেল— বিকিরণ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের ওপর দিয়ে প্রায় দু'শত পঁয়ষট্টি হাজার মাইল পথ ওটা পরিক্রমা করে এল। বাস্তবিক পক্ষে, পাইওনিয়র-৩-এর পর অন্তত তখনকার মত বিকিরণ অঞ্চলের একটা নিখুঁত চিত্র পাওয়ার মত বহু তথ্য আমাদের ঘরে এল। আমরা দুটো বিকিরণ বন্ধনীর সন্ধান পেলাম— একটা ভেতরের দিকের, যার বিকিরণের তীব্রতা প্রায় দু'হাজার মাইল দূরে সবচেয়ে বেশি এবং অপরটি বাইরের দিকের, দশ হাজার মাইল দূরে যার বিকিরণ-তীব্রতা সবচেয়ে বেশি। ঐ দূরত্বের পরপারে বিকিরণের স্তর দ্রুত নেমে আসে এবং চল্লিশ হাজার মাইল দূরে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ভান অ্যালেন তাঁর গ্লাসটা শেষ করে জো-র দিকে ফিরলেন— আর এক গ্লাস নাও।

— না, না, আমার আর লাগবে না, ধন্যবাদ। ঐ বিকিরণ বন্ধনীর উৎস সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি, আমি জানতে চাই। বিকিরণের বস্তুকণাগুলো কোত্থেকে আসে।

— ওরা কোথা থেকে আসছে? ভান অ্যালেন চিন্তামগ্ন ভাবে তরুণ

সহকারীর প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি ঘটালেন। অধিকাংশ আমেরিকান বিজ্ঞানীর, এমন কি আমার নিজেরও বিশ্বাস, এই সমস্ত বস্তুকণা সূর্য থেকে উদ্ভূত হচ্ছে এবং ওরা কোন প্রকারে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রে এসে পড়ছে। কিন্তু ঐরূপ সিদ্ধান্তে কিছু গলদ রয়ে গেছে; কোন না কোন বস্তুকণার শক্তি সৌরলোক থেকে সৃষ্ট হলে যা হওয়া উচিত, তার চেয়ে অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। ক্যালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী খ্রীষ্টোফিলোসের এবং সোভিয়েত পদার্থবিদ্ এস. এন. ভার্লভের মতটা কিন্তু অন্যরকম। তাঁরা মনে করেন যে নিউট্রন ক্ষয় হয়ে তড়িতাবিষ্ট বস্তুকণার সৃষ্টি করে। কোন কোন বস্তুকণা সম্বন্ধে আমারও তাই মত, কিন্তু নিউট্রন-ক্ষয়ের গণনা থেকে দেখা যায়, ঐরূপ ক্ষয় ধ্রুবীয় প্রকাশের দশ হাজার ভাগের এক ভাগের বেশি নয়। তা ছাড়া নিউট্রন ক্ষয় থেকে উদ্ভূত বস্তুকণার শক্তি থেকে এ-সমস্ত বস্তুকণার অধিকাংশেরই শক্তি অনেক কম। দুটো সিদ্ধান্তকে একত্রিত করলে কেমন হয়? ভেতরের দিকের বন্ধনীটা নিউট্রন ক্ষয় থেকে এবং বাইরের দিকেরটা সৌর-কণা থেকে। কিন্তু আমি নিশ্চিত হতে পারছি না, এই দুই কটিবন্ধের সংরচনা কোন অস্থির ঘটনা নয় তো? সম্ভবত ১৯৫৮ সাল অধিক সৌর সক্রিয়তার বর্ষ। আমরা যা করতে চাই, তা হলো, আমরা আরও দীর্ঘ-কাল ধরে প্রায় এক বছর ধরে বিকিরণের স্তর পরিমাপ করতে চাই এবং দেখতে চাই বিকিরণ-তীব্রতার এই ওঠা-নামা একদিকে সৌর প্রস্ফুটনের এবং অপর দিকে ভূ-চুম্বকীয় গোলযোগের জন্যে সৃষ্ট কি না। শীঘ্র এ-ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্যে আমরা অপর একটা কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাচ্ছি, জো।

— স্যর, আমি যা জানতে চাই তা হলো এই, জো বললেন— আপনার বিকিরণ বন্ধনীর আবিষ্কার, যা ভান অ্যালেন বন্ধনী নামে খ্যাত আমাদের মহাকাশ অভিযানে কি প্রভাব বিস্তার করবে? ঐ বিকিরণ কি মহাকাশ অভিযাত্রীর পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে না?

আমাদের পরিমাপ অনুসারে, ভান অ্যালেন উত্তর দিলেন— অন্তত ১৯৫৮ সালে, সর্বোচ্চ বিকিরণ স্তর দাঁড়াবে ঘণ্টায় দশ থেকে এক শ' রয়েন্টজনের মত। অবশ্য ওটা অনেকখানি নির্ভর করবে, গণনার দিক থেকে এখনো অনির্দিষ্ট প্রোটন ও ইলেকট্রনের আনুপাতিক পরিমাণের ওপর। যেহেতু মাত্র

দু'দিনের জন্য রয়েন্টজেন বিকিরণের সম্মুখীন হলে এক জন মানুষের পক্ষে বাঁচা-মরার সম্ভাবনা প্রায় সমান সমান, স্বাভাবিক ভাবেই এই বিকিরণ বন্ধনী মহাকাশ যাত্রীদের কাছে এক বিরাট বাধা। বিকিরণের প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত করার কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত, মনুষ্যযাত্রী রকেটগুলোকে মেরুর উপরিভাগের বিকিরণ-মুক্ত অঞ্চল দিয়ে পাড়ি দিতে হবে। বিকিরণ থেকে যাত্রী দেহ সংরক্ষণের বিষয়ে বিভিন্ন ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমরা পরবর্তী একটা কৃত্রিম উপগ্রহে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাব। কিন্তু মহাকাশ অভিযানের বাধাগুলো নিয়ে তুমি অতো মাথা ঘামিয়ো না, জো। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের অগ্রগতিকে কোন কিছুই রোধ করতে পারবে না। ব্রহ্মাণ্ড ও বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে মানুষের উত্তরোত্তর জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টাকে কোন কিছুই বাধা দিতে পারবে না। এমন দিন হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আসবে, যখন তোমার সন্তান-সন্ততি রবিবারে আকাশ ভ্রমণের কথা ভাববে, যেমন তুমি আজ হ্রদে ভ্রমণের কথা ভাবো।

পরমাশ্চর্য রশ্মি—লেসার

ন্যুইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছত্রিশ বছর বয়স্ক পদার্থবিদ্ অধ্যাপক ডঃ চার্লস টাউনেস, ১৯৫১ সালের এক সকালে ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে অনুষ্ঠিত এক সভায় নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন এবং প্রাতঃরাশের খোঁজ করছিলেন। কিন্তু ঐ সময় সমস্ত কাফেই বন্ধ ছিল। এই জন্যে তিনি ঘুরতে ঘুরতে ফ্র্যাঙ্কলিন পার্কে গিয়ে এক বেঞ্চির উপর বসে মৌসুমি ফুলের শোভা দেখতে দেখতে কিছু ভাবছিলেন।

মাথায় প্রশ্নের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। রেডিও, টেলিভিশন, রেডার প্রভৃতি যোগাযোগের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্বন্ধীয় প্রযুক্তিবিদ্যার নানা প্রণালী তিনি উপলব্ধি করছিলেন। ঐ সকল প্রণালী বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের উৎপাদন ও সম্যক বিকাশ করতে পারে। ঐ সব তরঙ্গে, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও তরঙ্গের কম্পনাঙ্কের বর্ণালী বিশ্লেষণের আলো ব্যাণ্ডের অনেক নিচের দিকে থাকে।

অধ্যাপক টাউনেস্ পরপর নিচু এবং উঁচু কম্পনাঙ্কের আলোক-রশ্মির বিচার করছিলেন। দীর্ঘতর এবং লঘুতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোকেই তাঁর মন অধিকার করেছিল। সঞ্চারণ তরঙ্গের ক্ষেত্রে অনুশাসিত কোহেরেণ্ট সঙ্কেতের উৎপাদন ইলেক্ট্রনিক টিউব এবং ট্রান্সিষ্টর দ্বারা সম্ভব হয়েছিল। কোহেরেণ্ট সঙ্কেতের বৈশিষ্ট্য হলো, ওটা এক বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের হয় এবং ওটা রশ্মির রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু লঘুতর, সূক্ষ্ম তরঙ্গ (মাইক্রোওয়েভ) এবং আলোক তরঙ্গ কেবল অসম্বদ্ধ আলোক-কলার রশ্মি দেয়। এই আলোক-কলা সূর্য, স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম অগ্নি, আলোকের ল্যাম্প— এই জাতীয় উপকরণ দ্বারা উৎসর্জিত হয়। ঐরূপ অনুশাসিত তরঙ্গে বিভিন্ন কম্পনাঙ্কের মিশ্রণ ঘটে এবং ঐ আলোক সর্বদিকে গমন করে।

ডঃ টাউনেস কিছুক্ষণ ধরে এই লঘু তরঙ্গের কলা সম্বন্ধ করার এবং বেতার তরঙ্গের মত অনুশাসিত এবং প্রবর্ধিত করার কথা চিন্তা করছিলেন। পার্কের নিকটবর্তী কাফে খোলার আগেই ওঁর মাথায় ঐরূপ কাজের মূল চিন্তা প্রকৃত রূপ গ্রহণ করেছে।
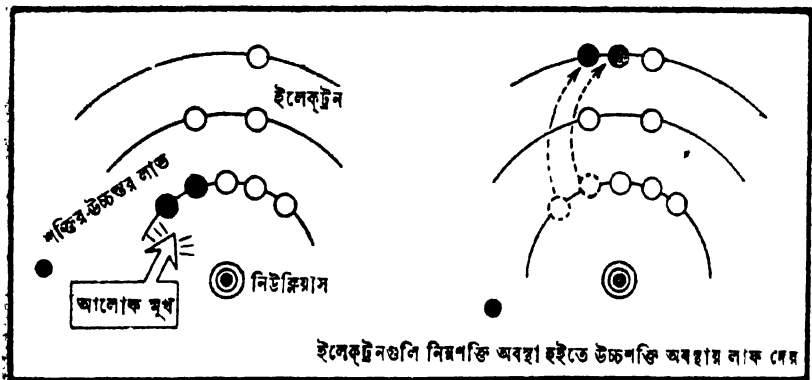
শক্তির বৃদ্ধি ও লাফ—প্রথম অবস্থা

ন্যুইয়র্কে ফিরে এসে তিনি নিজের দলের সঙ্গে ঐ কাজে লেগে গেলেন এবং তিন বছরের মধ্যে ঐ কাজ সমাধা করলেন। তাঁর এই উপলব্ধিই আমাদের শতাব্দীর এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের প্রথম পদক্ষেপ। টাউনেস দল নিজেদের প্রণালীর একটা নতুন শব্দ দিলেন, যার অর্থ ওর কার্যকারিতা বোঝায় : মেসর — যা মাইক্রোওয়েভ এম্প্লিফিকেশন বাই স্টিম্যুলেটেড এমিশন অব রেডিয়েশন-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

আধুনিক বিজ্ঞানের অন্য সব আবিষ্কার ও নতুন প্রক্রিয়ার মত মেসারও কোন একজন বিজ্ঞানীর একক আবিষ্কার নয় এবং উহা আকাশ থেকে এসে পদার্থবিদের মাথায় ভর করে নি — অন্যান্য সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মত মেসর পূর্বের অপরাপর অন্বেষণেরই ফলশ্রুতি। এইক্ষেত্রে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কণাবাদ (কোয়ান্টাম সিদ্ধান্ত) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। প্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী প্ল্যাঙ্কের মতানুসারে আলোক-রশ্মি স্রোতের মতো সতত তরঙ্গপ্রবাহ নয়, আলোক রশ্মি এক-একটা কণার আকারে উৎসর্জিত হয়। ওর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কণার নাম ফোটন, যা বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিকিরণের অত্যন্ত লঘু সংবেষ্টন এবং স্পেসে এক কণামাত্র যাত্রা করে। অতি সাধারণ আলোর বাতি সেকেণ্ডে লক্ষ লক্ষ ফোটন বিকীর্ণ করে।

আমরা জানি, প্রত্যেক পরমাণুর একটা নিউক্লিয়াস থাকে, যাকে পরিক্রমা করছে এক বা একাধিক ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-বাহক ইলেকট্রন। ঐ ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের চারিদিকে বিভিন্ন শক্তিস্তরে কক্ষপথে ঘুরছে। কোন বিশেষ অবস্থায় ঐ ইলেকট্রন একটা কক্ষ বা কোষ থেকে অন্য কক্ষে বা কোষে
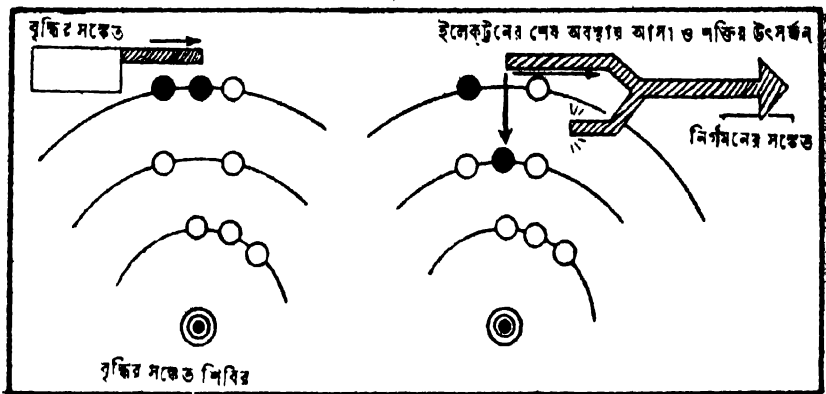
বৃদ্ধি—২য় অবস্থা

লাফ দিতে পারে। এই রকম করার সময় ইলেকট্রনের শক্তি কখনো কম, কখনো বা বেশি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি নিজের কক্ষে পরিক্রমা করতে করতে একটা ইলেকট্রন থেকে উপযুক্ত কম্পনাঙ্কের ফোটন যদি ঠিকরে আসে, তা হলে ঐ ফোটন উচ্চমানের শক্তির কক্ষে যেতে পারে এবং ওর বাইরের কক্ষেও পরিক্রমা করতে পারে। তখন ঐ পরমাণু অস্থায়ী এবং উত্তেজিত অবস্থায় পতিত হয় এবং ঐ অবস্থায় ইলেকট্রন নিজের পূর্বের কক্ষে ফিরে আসার চেষ্টা করে। যখন ওটা ঐখানে আসে তখন এক কোয়াণ্টাম শক্তি বিকীর্ণ করে, যা আলোকের একটা স্পন্দন। কোন কোন আলোকের উৎসর্জন উৎসের কাছে নিম্নমানের শক্তির স্তরে আসার ফলে ক্ষয় প্রক্রিয়ায় উৎসর্জিত হয়।

এইরূপে বিকিরণের প্রকার ও অবশোষণ ঘটে এবং এই প্রক্রিয়া কম্পনাঙ্কের ওপর নির্ভর করে। আপেক্ষিক তত্ত্বের জনক আইনষ্টাইন সর্ব প্রথম যুক্তি দেখান যে যদি পরমাণু শক্তির উৎসর্জন করতে সক্ষম হয়, যা এক বিশেষ কম্পনাঙ্কের রূপ পরিগ্রহ করে, তা হলে ওর ওপর ঐ কম্পনাঙ্ক সৃষ্টি হলে এইরূপ শক্তির সম্প্রেরণ সম্ভব। ফলে এক প্রকার শৃঙ্খল প্রক্রিয়ার শুরু হয়: উপযুক্ত কম্পনাঙ্কের ফোটনের রশ্মি উত্তেজিত পরমাণুগুলোর ইলেকট্রনের নিচের কক্ষে একসঙ্গে লাফ দিয়ে শক্তি বিকিরণ করার জন্যে সম্প্রেরণ ঘটাবে। এর পরিণাম শক্তির বৃদ্ধি, যতগুলো ফোটন ভেতরে গেল, তার চেয়ে
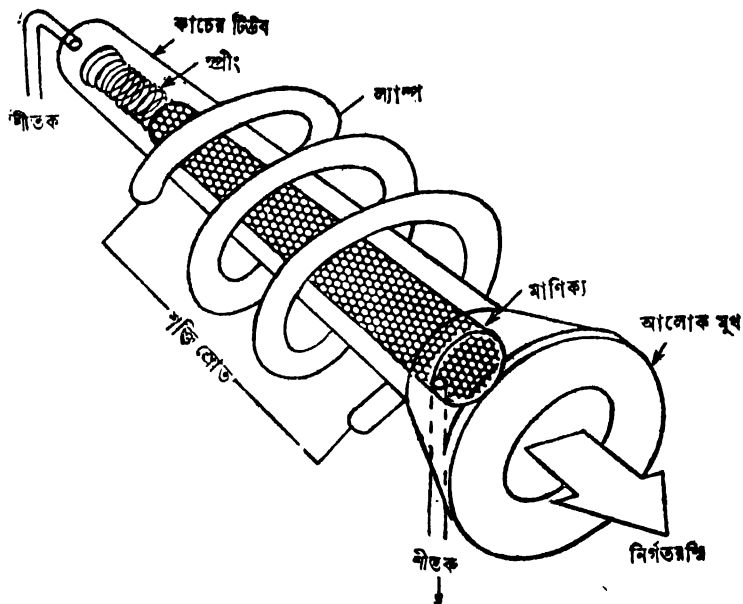
প্রথম মাণিক্য লেসারের রূপরেখা

অনেক বেশি ফোটন বাইরে ছুটে আসবে, এইজন্যে কেন্দ্রে নির্গত শক্তির পরিমাণ প্রযুক্ত শক্তির চেয়ে বেশি হবে।

অধ্যাপক টাউনেস প্রাতঃরাশের আগে এর রূপরেখা তৈরি করে ফেললেন এবং পরে তিনি মেসর প্রকল্পে এর বিকাশ সাধন করেন। ঐ আবিষ্কারকে কার্যে পরিণত করে এক বিরাট কাজ সম্পন্ন হলো। অ্যামোনিয়া গ্যাস সমেত সকল প্রকার পদার্থে প্রয়োগ করে একটা পেন্সিলের সমান মোটা সংশ্লিষ্ট মানিক্য শলাকা দ্বারা টাউনেস দল প্রথম সার্থক মেসর তৈরির কাজে সফলতা অর্জন করেন।

মানিক্যকে প্রথমে পরম শূন্য (—২৭৩° সেন্টিগ্রেড) তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা করা হলো। তারপর ওকে অত্যুচ্চ কম্পনাঙ্কের সূক্ষ্ম বেতার-তরঙ্গে সিঞ্চন করান হলো। তৎক্ষণাৎ লক্ষ লক্ষ পরমাণু নিম্নতম শক্তি পর্যায় থেকে উচ্চতম শক্তি পর্যায় পৌঁছে গেল। তখন সম্প্রেরক সূক্ষ্ম-তরঙ্গের কম্পানাঙ্ক পরিবর্তিত হলো, পরমাণুগুলো একের পর এক নিম্নস্তরে গিয়ে এবং সম্প্রেরক তরঙ্গের কম্পনাঙ্কের ওপরও ফোটনের উৎসর্জন করতে লাগল। এমনকি প্রত্যেক ফোটন আবার নিজে অপর পরমাণুগুলোকে সম্প্রেরিত করতে

লাগল এবং এইভাবে প্রত্যাশিত শৃঙ্খল প্রক্রিয়া শুরু করে পরমাণুগুলোকে নিম্নমানের শক্তির স্তরে নামিয়ে আনল। এইভাবে খুব তীব্র বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় সঙ্কেত উৎপাদিত হলো, যা প্রকৃতপক্ষে প্রথমে নিবিষ্ট সম্প্রেরক সূক্ষ্ম তরঙ্গের সঙ্কেত থেকে বহুগুণ বড় সম্প্রেরক তরঙ্গ। এইভাবে মেসর এক নতুন রকমের বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় প্রবর্ধক হিসেবে দেখা দিল, বিশেষ করে খুব কমজোরী সঙ্কেতের জন্যে এবং সর্বনিম্ন কম্পনাঙ্কের ক্ষেত্রে। মেসর রশ্মির এই আবিষ্কারের কাজে বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে সোভিয়েত দেশ উঠে পড়ে লেগে গেল। মস্কোর লেবেডেব সংস্থানের দু'জন পদার্থবিদ্ টাউনেসের কোন কোন পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করছিলেন এবং ১৯৬৪ সালে এই তিন বিজ্ঞানীই নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ঐ সময় সকলের মুখে মুখে এই তিন বিজ্ঞানীরই কথা ঘোরাফেরা করতে লাগল। লোকের মুখে, সংবাদপত্রে এবং জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকায় ঐ একটা শব্দ বারম্বার উচ্চারিত হলো : লেসার।

লেসার রশ্মি আবিষ্কারের পশ্চাতে এক বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী আছে। প্রত্যাশানুসারে যথোপযুক্ত মেসারের ক্ষেত্রে আলোকের (যেখানে লাল উজানি আলো শেষ হচ্ছে এবং দৃশ্যমান আলোক শুরু হচ্ছে) তরঙ্গের নিচে স্থান পেল।

কিন্তু টাউনেসের এক যুবক সহায়ক পদার্থবিদ্ রিচার্ড গোর্ডন গুল্ড নিজের অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন যে প্রকাশযোগ্য মেসার আলোকের কম্পনাঙ্কের ওপর কাজ করতে পারে। ঐ ব্যাপারে কৃতকার্য হবার উদ্দেশ্যে টাউনেস মন-প্রাণ ঢেলে দিলেন। টাউনেসের প্রসিদ্ধ মেসাচুসেট্স টেকনিক্যাল সংস্থায় প্রবেশ করে গুল্ড নিজেই পরীক্ষা শুরু করলেন এবং কলম্বিয়া প্রয়োগশালায় কিছু প্রয়োগ করে দেখলেন।

১৯৫৭ সালের ১লা নভেম্বরের আগের দিন রাত্রে টাউনেস যখন টেলিফোনে গুল্ডের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন তখন রিচার্ড গুল্ড মেসার সম্বন্ধে কিছু কলাকৌশলের ব্যাপার জানতে চাইলেন। বস্তুত উনি মেসারকে আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখছিলেন। তাঁর স্ত্রী পরে বললেন— রিচার্ড
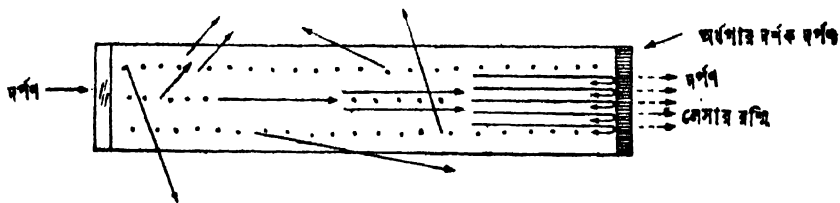
লেসার রশ্মি

টেলিফোনে কথা বলতে বলতে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছে। তাঁর মনে সংশয় দেখা দিয়েছিল যে টাউনেস হয়তো গুল্ডের মত এ-ব্যাপারে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছেন। এইজন্য নিজের দাবি প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে তিনি আরও উঠে পড়ে লাগতে চেয়েছিলেন।

গুল্ড আগে পনের দিন ধরে ওঁর পরীক্ষার পরিণাম ও আবিষ্কারের কথা একটা ছোট নোটবুকে লিখলেন। তারপর উনি পাশের একটা মিষ্টির দোকানে গিয়ে ঢুকলেন। ঐ মিষ্টির দোকানেই ছিল নোটারি—লেখ্য প্রমাণের অফিসে। গুল্ড ওখানকার টেবিলের ওপর নিজের ছোট্ট নোটবুকটি রেখে দিলেন। উনি নিজের পর্যবেক্ষণ সম্বলিত প্রবন্ধের নামকরণ করলেন 'লেসার' (লাইট অ্যাম্প্লিফিকেশন বাই ষ্টিম্যুলেটেড এমিশন অফ রেডিয়েশন)-এর সম্ভাব্যতার ওপর কিছু প্রাথমিক গণনা। লেখ্য প্রমাণক নিজের তারিখ ও ষ্ট্যাম্প ওর প্রথম নয় পৃষ্ঠায় লাগিয়ে দিলেন। এইভাবে গুল্ড লেসার আবিষ্কারের ব্যাপারে নিজের দাবি সর্বপ্রথম পেশ করে রাখলেন।

ঠিকই করেছিলেন গুল্ড, কারণ লেসার তখন বড় বড় বিজ্ঞানীদের ফ্যাশনে এসে গেছে। গুল্ডের মিষ্টির দোকানে যাবার পর কয়েক মাসের মধ্যে টাউনেস এবং প্রসিদ্ধ বেল প্রয়োগশালার কাজে নিযুক্ত তাঁর কয়েকজন সহকর্মী বিজ্ঞানী নিজেদের প্রবন্ধ (লাল উজানি আলো এবং প্রকাশযোগ্য মেসার) আবিষ্কার করলেন। অপর একজন সোভিয়েত বিজ্ঞানীও নিজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গণনা অনুযায়ী মিজের মতবাদটা জানতে চাইলেন এবং ঐরূপ করলেন। ১৯৬০ সালে এতদিনকার 'যাদু' বলে কথিত তত্ত্বটা দানা বাঁধল। ক্যালিফোর্ণিয়ার হিউজেস বিমান কোম্পানির প্রয়োগশালায় ডঃ টি. এইচ. মৈমান সর্বপ্রথম অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে লেসার তৈরি করলেন।

মেসারের মতন লেসারেরও প্রবর্ধন মাধ্যম সংশ্লিষ্ট মানিক্য-শলাকা অর্ধ সিগারেটের সমান লম্বা ছিল। ওর দুই প্রান্ত মসৃণ সমতল। দুই প্রান্তে দর্পণ তৈরির জন্যে রৌপ্য চড়িয়ে দেওয়া হলো, কিন্তু এক প্রান্তে রৌপ্যের পরিমাণ ছিল কিছু কম। ফলে ঐ প্রান্ত অর্ধপার দর্শক হয়ে গেল। একটি শক্তিশালী ফটোগ্রাফির স্পার্ক ল্যাম্প মানিক্যের চারিধারে কুণ্ডলীর আকারে লেপ্টে রইল। এটাই হলো সম্প্রেরক আলোকের স্রোত।

অতঃপর যখন আলোকের ছোট স্পন্দন মানিক্যে প্রেরণ করা হলো, তখন অর্ধপার দর্শকের মাথায় দেদীপ্যমান ঘন লাল রশ্মি বিকীর্ণ হলো, কিন্তু এই লেসার আলোক, যা নিচের শক্তির স্তরে পরমাণু থেকে নির্গত রাশি রাশি ফোটন কণা থেকে সৃষ্টি হলো, তা সাধারণ আলো নয়, কিন্তু দেখালো সাধারণ আলোরই মত। প্রকৃতপক্ষে ওটা প্রথম সমছন্দ তরঙ্গ-বিশিষ্ট আলোক। যে আলোক-তরঙ্গে ঢেউগুলো পর পর একই সঙ্গে মিছিল করে চলে। ঐরূপ আলোক তরঙ্গে আলোকের বর্ণালী যে যার বর্ণ স্পষ্টভাবে ধরে রাখল, বিচ্ছুরিত হয়ে একে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে গেল না। ফলে এই লেসার-রশ্মি নিজেদের মূল শক্তি এবং ওর প্রজ্জ্বলন অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হলো।

লেসার মানিক্যের দুই প্রান্তের পাশে ফোটন কণাগুলো দর্পণ থেকে ও দর্পণ আসা-যাওয়া করে যতক্ষণ না পায়ে পা মিলিয়ে কুচকাওয়াজ করার উদ্দেশ্যে অনুশাসিত হয়ে ওঠে এবং ওরা অর্ধপার দর্শকের মাথায় একটা শক্তিশালী রশ্মির আকার গ্রহণ করে তীরের মত বেরিয়ে আসে— এই রশ্মির শক্তির ঘনত্ব খুব বেশি। কিন্তু এইরূপ মানিক্য লেসার ঐ প্রান্তভাগেই ঝকমক করে ওঠে, অন্য বিশেষ কিছু ওটা করতে পারে না। পরে যখন অন্য পদার্থ থেকে লেসার তৈরি শুরু হলো, তখন লেসার রশ্মির শক্তির তীব্রতা গেল এত বেড়ে যে ঐ রশ্মির সাহায্যে কঠিনতম পদার্থকে কাটা, এমন কি বাষ্পীভূত করা সম্ভব হয়ে উঠল।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লেসার রশ্মির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ওকে নানা দিকে প্রয়োগ করার কথা চিন্তা করা হলো। দুরূহ সমস্যার কথাও ভাবা হলো, যা একমাত্র লেসার রশ্মিই সমাধান করতে পারে—সঞ্চরণ তথা মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে, জ্যোতির্বিজ্ঞান তথা কম্প্যুটার কলাকৌশলে, চিকিৎসা তথা স্থাপত্য
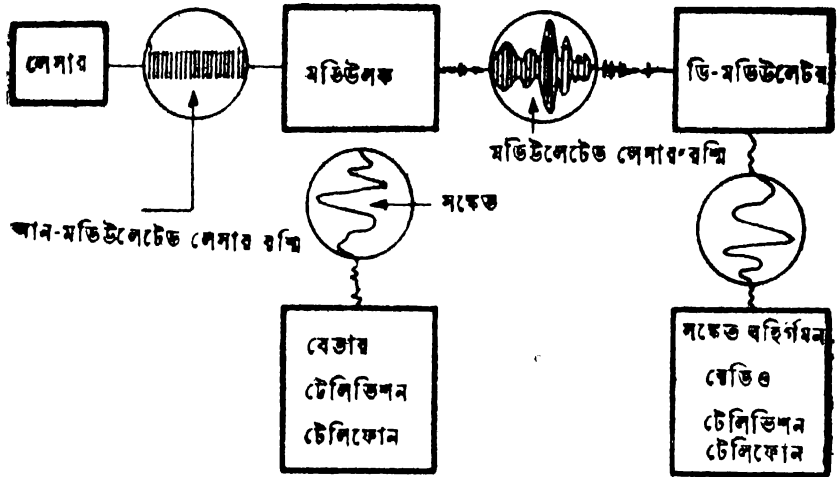
ন্যুইয়র্ক এবং লস্ এঞ্জেলেস-এর মধ্যে লেসার দ্বারা যোগাযোগ

বিজ্ঞানে, ফটোগ্রাফী, চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন ক্ষেত্রে। প্রকৃত পক্ষে লেসার রশ্মি বিজ্ঞানের ধ্যান-ধারণায় এক নতুন প্রণালীর জন্ম দিল।

প্রথম কয়েক বছর লেসার রশ্মির বিকাশ পর্যবেক্ষণ করে অধ্যাপক টাউনেস লিখলেন : লেসার রশ্মি দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরিলক্ষিত ও বিভেদ্য লঘুতম ক্ষেত্রকেও প্রকাশিত করতে পারে। অপরদিকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরিলক্ষিত ও বিভেদ্য লঘুতম ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত হতে পারে। লেসার স্পন্দনের শক্তি ও ঘনত্ব কল্পনাতীত। ইলেকট্রনিক এবং আলোকবিজ্ঞানর এমন কোন ক্ষেত্র নেই, যেখানে এই অকল্পনীয় রশ্মির যোগ্যতার কথা ভাবা যায় না। অতি আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে দিকে লেসার রশ্মির স্বচ্ছন্দে পদচারণা।

প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে লেসার রশ্মির প্রয়োগ এবার দেখা যাক। ১৯৬২ সালে লেসার রশ্মির দ্বারা চন্দ্রলোকের ছোট ছোট ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হলো এবং ঐ পাঠ পৃথিবীতে প্রেরণ করা সম্ভব হলো। লেসার রশ্মির এই প্রয়োগের ফলে দেখা গেল যে ঐ রশ্মি পরিশুদ্ধতম পরিমাপক ফিতার মত মহাকাশের পরিমাপ করতে পারে এবং পৃথিবী পরিক্রমাকারী কৃত্রিম উপগ্রহের কাছে কম শক্তিশালী সঙ্কেতকে প্রবর্ধন করার কাজে দক্ষ প্রবর্ধকের মত কাজ করে।

মহাকাশযানে ব্যবহৃত লেসার রশ্মি কেবল যাতায়াতে সাহায্য করে না,

মহাকাশযানকে নিয়ন্ত্রণ করে, ওকে সঠিক পথের নিশানা দেয়। ফিড্ব্যাক প্রথায় লেসার রশ্মি আকাশ-যানের যাত্রাপথের ত্রুটিগুলো সাগ্রহে লক্ষ্য করে ওকে সব কিছু করার আদেশ দেয়, প্রয়োজনমত রিট্রোরকেট প্রজ্জ্বলিত করে দেয়।

লেসারের সাহায্যে কথাবার্তা বলা যায়। লেসার পিস্তল থেকে একটা আলোক-রশ্মি বেরিয়ে আসে, সম্ভবত অদৃশ্য লাল-উজানি ক্ষেত্রে যা আপনার ভাষণ মাইক্রোফোনের সাহায্যে মডিউলেটেড হয়। সংগ্রাহক যন্ত্র দ্বারা লেসার রশ্মি শ্রবণযোগ্য ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। এই রশ্মি অন্ধকার, কুয়াসা, বর্ষা সব কিছু ভেদ করতে পারে। এই বিশেষ গুণের সাহায্যে লেসার রশ্মি উড়োজাহাজকে অন্ধভাবে অবতরণে সহায়তা করে।

কারিগরী ক্ষেত্রে লেসার রশ্মি অত্যন্ত বিচক্ষণ ড্রিলের মত কাজ করে, যা ইস্পাত এবং কারিগরী হীরাকেও ড্রিলিং করতে পারে। এই শক্তি লেসারের অভ্যন্তরের মানিক্যের জন্য নয়, কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাসের। এই রকমের লেসার এক ইঞ্চি মোটা মার্বেল শলাকাকে ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে টুকরো টুকরো করে দেয়। লেসার কয়লাকে এত গরম করতে পারে যে কয়লা আপনার স্তরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। খাল খনন ও সুড়ঙ্গ তৈরি শক্তিশালী লেসার দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। এমনকি, পাথর কাটার ব্যাপারে লেসার-রশ্মির নির্দেশ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। নির্মাণকার্যে খুব উঁচু ইমারত নির্মাণে অত্যন্ত পরিশুদ্ধ প্লাম্বলাইন হিসাবে লেসারের উপযোগিতা ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

কম্প্যুটারের কাজে লেসার রশ্মির ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে লেসার রশ্মির কাজ অত্যন্ত সূক্ষ্ম পেন্সিলের মত, এইজন্যে এই রশ্মি স্মৃতি বিভাগের অত্যন্ত সূক্ষ্ম স্থানে কুশলী লিপি-লেখনের কাজ করে থাকে। এই কার্যে হীলিয়াম লেসার বিশেষ উপযোগী প্রমাণিত হয়েছে। বস্তুত একটা লেসার পেন্সিল এক মিলিমিটারের সহস্রাংশের মধ্যে দশ কোটি অঙ্ক লিপিবদ্ধ করতে পারে, এমন কি কম্প্যুটারের গণনা বিভাগের পক্ষে এই অঙ্ক বার করে দেওয়াও কোন কঠিন কাজ নয়। কারিগরী এবং সাইবারনেটিক্সের চেয়ে লেসার চিকিৎসাবিজ্ঞানে অনেক তাড়াতাড়ি স্থান করে নিয়েছে। ১৯৬৫ সালে সংবাদপত্রে ছাপা হলো যে লণ্ডনের উইণ্ডসরের ডিউকের চোখে লেসার শল্য চিকিৎসায় বেঁচে গেছে। তাঁর দৃষ্টিপটলের একটা দিক অক্ষিগোলক থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। গরম লেসার রশ্মি ওটা এক সেকেণ্ডের এক অংশের
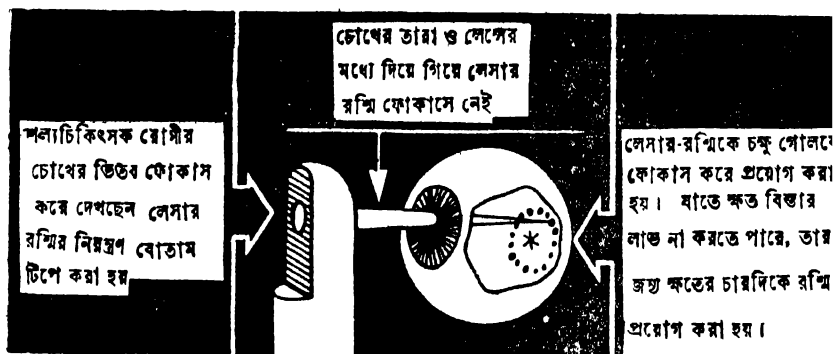
চক্ষু গোলকের ক্ষতের লেসার চিকিৎসা

মধ্যে জুড়ে দিল। দু'বছর বাদেই আমেরিকার প্রযুক্তিবিদ্যা বিশারদেরা আলোকের ছুরি তৈরী করলেন। ওটা হলো একটা লেসার টর্চ, যা আলোক-রশ্মিকে শল্য চিকিৎসার উপযোগী একটা তীক্ষ্ণ ছুরিকার মত করে তুলল। এই আলোক ছুরিকার বিশেষ প্রয়োগ দেখা দিল চর্মের ক্যান্সার (ক্ষত পরিষ্কারের কাজেও) অদূর ভবিষ্যতে লেসার রশ্মির সাহায্যে আরও নতুন নতুন অকল্পনীয় চিকিৎসার উপকরণ তৈরী হবে, আশা করা যায়।

এ পর্যন্ত ভূ-কম্পনের ভবিষ্যৎবাণী করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু লেসার রশ্মি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভূ-ত্বকের অভ্যন্তরের সামান্যতম বিচলন ও পর্যবেক্ষণ মাপবার এক শক্তিশালী হাতিয়ার মানুষের হাতে এল। বড় বড় ভূ-কম্পনের পূর্বাভাষ এই লেসার হামেশাই জানিয়ে দেয়। এই রশ্মি ভূ-কম্পনের জন্য কুখ্যাত ক্যালিফোর্ণিয়ার ভূ-কম্পনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে হতে বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা 'গ্লাস' (জিওলজিক্যাল লেসার সার্ভে সিষ্টেম)-এর জন্ম দেয়। এই টেকনিকে উপত্যকার একটি মনিটর ষ্টেশন থেকে উঁচু হওয়া জমির ওপর দ্বিতীয় ষ্টেশন পর্যন্ত রশ্মি পাঠান হয়।

লেসার রশ্মির অসাধারণ পরিশুদ্ধতার ফলে ভূ-বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ভূ-ভাগের এক সেন্টিমিটারের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ সূক্ষ্মকম্পন অথবা বিচলনও ধরা সম্ভব হয়ে ওঠে। এই বিচলন পরিমাপ থেকে ভূ-গর্ভস্থ প্রতিবল ক্ষেত্রে অনেক ঘটমান সংক্ষোভের সংবাদ পাওয়া যায়।

লেসার রশ্মির এক অপ্রত্যাশিত ব্যবহার দর্জিগিরিতে। দোকানে খরিদ্দারের জামা-প্যান্টের মাপ লেসার-ব্যবস্থার ক্যামেরায় তোলা হয়।
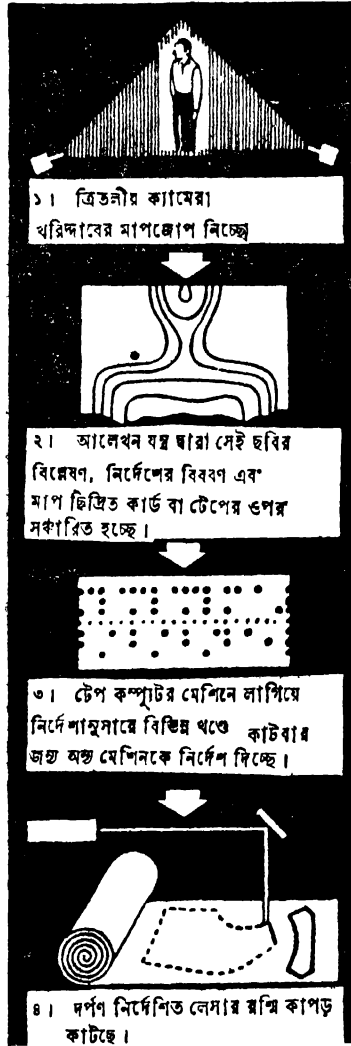
লেসার দ্বারা
পোষাক তৈরি

কটোর বিশ্লেষণ এবং আলেখন মেশিনে করা হয়, যা খরিদ্দারের মাপ ছিদ্রযুক্ত কার্ডে এবং চুম্বকীয় ফিতে-তে রেকর্ড করে দেয়। সেলাই কারখানায় এই ফিতে কম্প্যুটরে লাগিয়ে দেওয়া হয়, যা লেসারকে নির্দেশ দেয়। লেসার রশ্মি গতিশীল দর্পণের সাহায্যে নির্দেশ গ্রহণ করে, যা ওটা ঠিকমত গ্রহণ করে কাপড়ের টেবিলে মাপানুযায়ী কাপড় কাটার জন্যে নিয়ে যায়। বহু-সংখ্যক পোষাক তৈরির বেলায় লেসারে কম্প্যুটরের আদেশ নির্দিষ্ট সংখ্যা পর্যন্তই দৌড়াদৌড়ি করে এবং লেসার রশ্মি প্রত্যেক কাপড় দ্রুত সাফাই করে

রশ্মি

এবং বিশেষ যত্ন সহকারে কেটে দেয়। এক ওস্তাদ দর্জির কথায়, সেলাই মেশিনের পরে কাপড়ের ব্যাপারে বিশেষ প্রগতি দেখা দিয়েছে।

লেসার রশ্মির প্রভাবে এর চেয়েও অধিক বিস্ময়কর পরিবর্তন এসেছে ফটোগ্রাফীর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশনের ক্ষেত্রে। শিকাগো শহরে ১৯৭১ সালে এক বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে দর্শকবৃন্দ দেখল, গৃহছাদ ও মেঝের কার্পেটের মধ্যে হাওয়ায় একটি সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক ঝুলছে। দর্শকেরা ওটা ছুঁতে গিয়ে বিফল হলো, কারণ ঐ ট্যাঙ্ক ছিল একটা চিত্র মাত্র— এক অগ্রণী হলোগ্রাম— যা বিনা ক্যামেরা বা লেন্সে তোলা হয়েছে।

এই বুদ্ধিদীপ্ত আবিষ্কারের কাহিনী কয়েক দশক আগের। সতের বছর বয়স্ক একটি হাঙ্গেরীয় ছাত্র, ডেনিস গেবর, যিনি পরবর্তীকালে লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের বিদ্যুৎ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক হয়েছিলেন, তাঁরই মাথায় ঐ ভাবনাটা সর্বপ্রথম দেখা দেয়। সপ্তদশ শতাব্দীর হল্যাণ্ডবাসী বিজ্ঞানী হাইজেন্সের তরঙ্গাগ্র সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করে গেবর কাজ শুরু করেছিলেন। বিজ্ঞানী হাইজেন্স সর্বপ্রথম আলোককে তরঙ্গগতি রূপে বুঝতে পেরেছিলেন। যুবক গেবর ছিলেন ফটোপ্রেমিক। তিনি হাইজেন্সের সিদ্ধান্তের ফটো নেবার জন্যে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তিনি ভাবলেন, যখন ফটো তোলা হয়, তখন প্রতিচ্ছবি ফিল্মাংশের ওপর তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু হাইজেন্স অনুসারে আলোক-কিরণ দ্বারা বাহিত বস্তু তথ্য ফিল্মে পৌঁছানোর আগে প্রত্যেক অংশের ওপর অদৃশ্যরূপে উপস্থাপিত হওয়া উচিত। কি, কোন উপায় কি আছে, যা দিয়ে কোন একটি পছন্দমত অংশে ফিল্মের মত কোন কঠিন পদার্থ ব্যবহার না করে ছবিকে দৃশ্যমান করা যায়, আর আবছা কি এমন কোন আভাস সৃষ্টি হয়, যা সম্ভবত সমস্ত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মিশ্রিত সাদা আলোর একটি মাত্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের শুদ্ধ আলো দিয়ে প্রকাশ করা যায়? লেসার আবির্ভাবের পর মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা গেবরের অনুসন্ধানের ওপর কাজ করার জন্যে যোজনা তৈরি করলেন। এইভাবে হলোগ্রাফীর জন্ম হলো। এতে ক্যামেরা বা লেন্সের প্রয়োজন হয় না। উপরন্তু ইহা মূল বস্তুর ত্রিতলীয় চিত্র পুনর্নিমাণ করতে পারে। এই ত্রিতলীয় হলোগ্রাম তৈরির জন্যে এক্সপোজ না করা একটি ফিল্ম বস্তুর সামনে রেখে দেওয়া হয়। লেসার রশ্মির একভাগ ফিল্মের ওপর (যাকে হলোগ্রাম
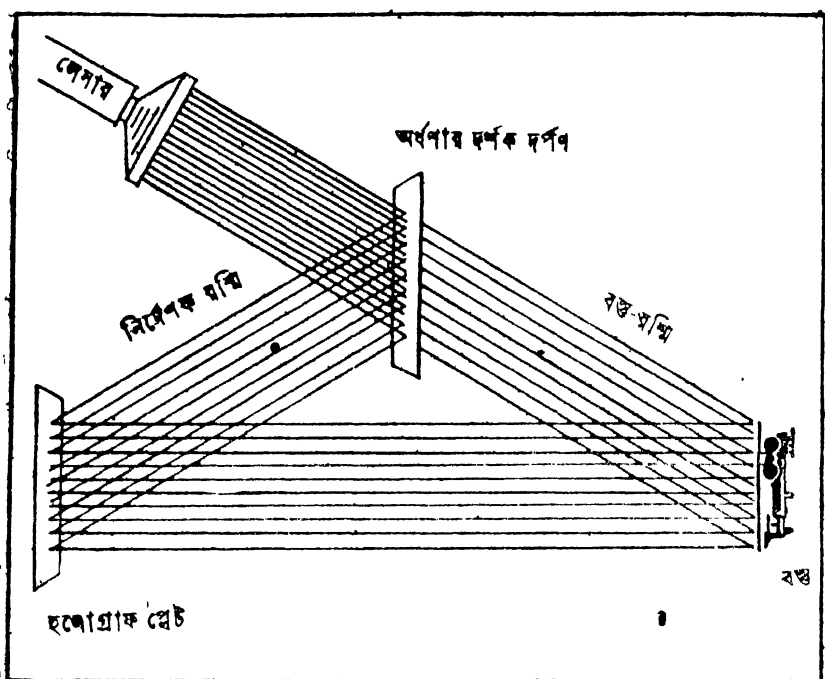
হলোগ্রাফী

বলে) বিক্ষেপিত করা হয় আর বাকি রশ্মিকে অর্ধ দর্পণ থেকে বস্তু পর্যন্ত প্রেরণ করা হয়। বিক্ষেপিত লেসার রশ্মি এবং বস্তু দ্বারা পরিবর্তিত লেসার আলোক দুই-ই পট্টির ওপর নিজের প্রতিরূপ তৈরি করে। এইভাবে একটা বিপরীত চিত্র তৈরি হয়ে যায়।

যখন পট্টিটা ধোয়া হয়, তখন এমন চিত্র ফুটে ওঠে, যা গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজিয়ে গান শোনার মতন। ফিল্মের ওপর কোন চিত্র নেই কেবল একটা লেসার রশ্মি প্লেটের অপর পারে চলে যাচ্ছে, ফলে যে আলোক-তরঙ্গের প্রতিরূপ সৃষ্টি হচ্ছে, তা দৃষ্টিতে এসে ত্রিতলীয় চিত্র তুলে ধরছে।

ভবিষ্যতে হলোগ্রাফীর সম্ভাবনা অনন্ত। সারা দুনিয়ায় শত শত প্রয়োগ-শালায় ব্যবসায়ী এবং অব্যবসায়ী ফটোগ্রাফারদের কাজে, চলচ্চিত্র টেলিভিশনে সাইবার নেটিক্স-এ (অতি শীঘ্র ক্রমবীক্ষণ কার্যে, যা ছাপা বিষয় বস্তুর কম্প্যুটার-ভাষায় অনুবাদ করে) হলোগ্রাফী প্রয়োগের সম্ভাবনা প্রচুর—প্রযুক্তি বিদ্যার নানাক্ষেত্রে, সূক্ষ্ম মেশিনের উৎপাদিত বস্তুর নিরীক্ষণে

এবং ত্রিতলীয় এক্স-রে চিত্রের চিকিৎসা-বিজ্ঞানে হলোগ্রাফীর আরও বিস্ময়কর সম্ভাবনা হলো, হলোগ্রাফী গুপ্ত সংবাদ জানিয়ে দিতে পারে।

আরও বড় কথা, আমাদের প্রাচীন বিজ্ঞানীদের মৃত্যুবাণের কল্পনাকে বাস্তবে যেন রূপ দিচ্ছে লেসার। লেসার রশ্মি প্রাণ-নাশক কিরণ হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র গোল্ডফিঙ্গার-এ মিঃ গোল্ডফিঙ্গার 'অমর' জেম্স ব্যাণ্ডকে লেসার দ্বারা দু'টুকরো করার চেষ্টা করেছেন। লেসার রশ্মির কার্যকারিতা হলো শত্রু ধরা পড়লে ওকে অন্য যে কোন উপায়ের চেয়ে লেসার রশ্মির সাহায্যে অনেক সহজে খতম করা যায়। এ-বিষয়ে আজ আর কোন দ্বিমত নেই যে লেসারের সামরিক দিক থেকেও সম্ভাবনা প্রচুর। কারণ এই রশ্মি এক্স-রে'র চেয়েও ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে পদার্থের অপর পারে যেতে এবং তাকে জ্বলোতে পারে। লেসারের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা হলো, লেসার-তোপের, যা অন্তর্মহাদেশীয় নিউক্লিয়ার ক্ষেপনাস্ত্রকে ওর ওড়ার পথে, ওর টার্গেট নষ্ট করার আগেই, ধ্বংস করে দিতে পারে। এমন কি আমাদের অজান্তেই এমনও হতে পারে যে লেসার নির্দেশিত বোমা আমাদের কাছেই রয়েছে, কেননা যে কোন বাহিনী তাদের ধ্বংস খেলনার বিষয়ে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে। বোমার লেসার নির্দেশনা দুটো বিমান থেকে হয়। নিচের ওড়া-বিমান লেসারের সাহায্যে টার্গেটকে পরিশুদ্ধভাবে সনাক্ত করে এবং ওর ওপরে-ওড়া দ্রুতগামী সাথী বোমারু বিমানে লাগানো স্বয়ংচালিত বৈদ্যুতিক আলোকযুক্ত অন্বেষক শীর্ষক-প্রত্যাবর্তিত লেসার রশ্মি ধরে নিজের বোমা নির্দিষ্ট নিশানায় ফেলে দেয়।

আমাদের আশা, আগামী দিনে যুদ্ধমান দুই পক্ষের অস্ত্রাগারেই পরস্পরকে টেক্কা দিয়ে লেসার হাতিয়ার থাকবে যেমন আজ উভয় পক্ষের হাতেই পরমাণু অস্ত্র রয়েছে। এইজন্য উভয় পক্ষের সৈন্যাধ্যক্ষরাই এ হাতিয়ার ব্যবহার করতে ইতস্তত করবেন। ফলে বিজ্ঞান আশ্রিত সভ্যতার আগামী দিনে মানব-কল্যানের দিক চেয়ে মন্ত্রমুগ্ধকারী এই লেসার এবং অন্য সব উপযোগী রশ্মি মানুষের এই পৃথিবীতে বিশ্বশান্তি ও বিশ্বকল্যাণের কাজে ব্যবহৃত হবে।